চিল্ড্রেন'স এডুকেশন সিরিজ (৩য় থেকে ৮ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)

Book-10

ছোটদের মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবনী

আমির জামান

নাজমা জামান

Published by

Institute of Family Development, Canada

www.themessagecanada.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

মন্তব্য/পরামর্শ	আমির জামান/নাজমা জামান টরন্টো, ক্যানাডা info@themessagecanada.com
১ম প্রকাশ	মে ২০১৩
২য় প্রকাশ	জানুয়ারী ২০১৬
৩য় প্রকাশ	জানুয়ারী ২০১৮
প্রশ্ন পর্ব সহযোগিতায়	জেনিফা তাহ্‌রীম (উপমা)
সার্বিক সহযোগিতায়	রোকসানা পারভীন (রুমা)
ভাষা সহযোগিতায়	প্রমি, রজিত, তন্নী
প্রচ্ছদ সহযোগিতায়	জারা, রামিসা, জুমানা
© কপিরাইট	আই.এফ.ডি ট্রাস্ট
প্রাপ্তিস্থান	আই.এফ.ডি ট্রাস্ট মুহাম্মাদপুর, ঢাকা ০১৭১০২১৯৩১০, ০১৬৮২৭১১২০৬ আল মারুফ পাবলিকেশনস কাটাবন মসজিদ, ঢাকা ০২৯৬৭৩২৩৭, ০১৯১৩৫১০৯৯১ কবির পাবলিশার্স চট্টগ্রাম ০১৬১৩০৬১৬৫৩
মূল্য	প্রতিটি বই ১০০ টাকা (Fixed price) ১২টি বইয়ের সম্পূর্ণ সেট ১২০০ টাকা (Fixed price)

অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য বিশেষ গাইডলাইন

আমরা অভিভাবক এবং শিক্ষক/শিক্ষিকারা যখন আমাদের বাচ্চাদের ইসলামিক সায়েন্স সিরিজের বইগুলো পড়াবো তখন নিম্নের কিছু গাইডলাইন অনুসরণ করার চেষ্টা করবো। এতে আমাদের সন্তানরা আরো বেশী উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

১) আমরা অভিভাবকরা যদি রুটিন করে এই সিরিজের ১২টি বই আমাদের সন্তানদের নিজ ঘরে নিজ তত্ত্বাবধানে পড়াই তাহলে সে দুই বছরের মধ্যে ইসলামিক সায়েন্সের উপর পূর্ণাঙ্গ নলেজ নিয়ে গড়ে উঠবে এবং মজবুত ঈমানের অধিকারী হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

২) সন্তানদের পড়ানোর আগে নিজে পুরো বইটি আগাগোড়া পড়ে নিবো। সন্তানদের যেন কোন বিষয়ে গোজামিল দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা না করি। প্রতিটি বিষয়ের সাথে বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করি। তারা যেন প্রতিটি বিষয় আনন্দের সাথে শিক্ষাগ্রহণ করে।

৩) প্রতিটি বিষয়ে রসূল ﷺ-কে রোল মডেল হিসেবে তুলে ধরতে হবে। রসূল ﷺ-এর জীবনী এবং সাহাবা (রা.)-দের জীবনী পড়ার পাশাপাশি রসূল ﷺ-এর জীবনীর উপর তৈরী মুভি এবং কার্টুন-এর ভিডিও দেখতে পারি। প্রতিটি অভিভাবকেরই উচিত রসূল ﷺ -এর জীবনী "আর-রাহীকুল মাখতুম" বইটি পড়ে বিস্তারিত জেনে নেয়া।

৪) রসূল ﷺ যেভাবে সলাত আদায় করতে বলেছেন তা সহীহ হাদীসগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। এই সিরিজের সলাত শিক্ষার বইটিতে সলাতের প্রতিটি স্টেপ সহীহ হাদীস থেকে নেয়া হয়েছে। সহীহভাবে সলাত আদায়ের ভিডিও ও লেকচার ইউটিউবে পাওয়া যায়, তা দেখে আমরা সলাতটি ঠিক করে নিতে পারি। আমরা বড়রা যখন সলাত আদায় করি তখন যেন সন্তানদের সাথে নিয়ে আদায় করি এবং তাদেরকে সবসময় মসজিদে নিয়ে যাই হোক সে ছেলে বা মেয়ে। কাতারে নিজের পাশে দাঁড় করাই এবং তাদেরকে যেন পিছনে ঠেলে না দেই।

৫) ছোটবেলা থেকেই সন্তানদেরকে সদাকার অভ্যাস করানো উচিত। দেশের অসহায়-দরিদ্র এবং গরীব আত্মীয়দের সাহায্য সহযোগীতা করার জন্য ছোটবেলা থেকেই সন্তানদেরকে শিক্ষা দেয়া উচিত।

৬) ইসলামী আদব শিক্ষার বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে যেন তারা পড়ার পাশাপাশি ঐ মুহূর্ত থেকেই প্রাকটিক্যাল করে থাকে। ইসলামী আদব বইয়ে উল্লেখিত সমস্ত আদবগুলো সন্তানরা ঠিক মতো প্রয়োগ করছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখি। প্রথম প্রথম সে হয়তো ভুলে যেতে পারে তৎক্ষণাৎ তাকে আদবের সাথে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, তুমি সালাম দিতে ভুলে গেছ বা ঐ দু'আটা বলতে ভুলে গেছ ইত্যাদি, এমনভাবে বলা যাবে না যে সে অপমান বোধ করে। তবে একটি বিষয় খুবই সতর্ক থাকতে হবে যে আমরা তাদেরকে যা শিখানোর চেষ্টা করছি তা যেন আমরা নিজেরাও ঠিক মতো পালন করি তা না হলে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্বও তাদের কাছে কমে যাবে।

৭) নিজ বাসায় সন্তানদের জন্য একটি পারিবারিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এছাড়া IFD প্রকাশিত "প্যারেন্টিং" এবং "ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনে কীভাবে সফলতা অর্জন করবে" এই বই দু'টি যোগাড় করে অবশ্যই প্রতিটি অভিভাবকের পড়ে নেয়া উচিত। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

সূচীপত্র

রসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্ম	৫
হাতীর ঘটনা	৫
দুধ পান	৫
মায়ের স্নেহে ও দাদার আদরে	৬
দাদার মৃত্যু	৬
চাচা আবু তালিবের স্নেহে শিশু মুহাম্মাদ	৬
সিরিয়ায় যাত্রা (ব্যবসার উদ্দেশ্যে)	৬
খাদীজার (রা.) সাথে বিয়ে	৬
কাবা গৃহের পুনর্নির্মাণ এবং হাজরে আসওয়াদের বিরোধ মিমাংসা	৭
ওহী নিয়ে জিবরাঈল (আ.)-এর আগমন এবং নবুয়তলাভ	৮
দাওয়াতের কাজে কষ্ট শ্রম	৯
হাবশায় হিজরত	১০
হামযা (রা.) এবং ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ	১০
সর্বাত্মক বয়কট	১০
শাবি আবু তালিবে তিন বছর অবস্থান	১১
শোক-দুঃখের বছর	১২
তায়েফে রসূল ﷺ -এর ইসলামের দাওয়াত	১৩
রসূলুল্লাহ ﷺ -এর মি'রাজ	১৪
রসূলুল্লাহ ﷺ -এর হিজরত	১৬
মদীনায় প্রবেশ	১৭
মসজিদে নববী নির্মাণ	১৭
বদরের যুদ্ধ	১৮
ওহুদের যুদ্ধ	২০
হুদায়বিয়ার সন্ধি	২১
বিভিন্ন দেশের বাদশাহ এবং রাজাদের নামে চিঠি	২৩
খায়বর অভিমুখে যাত্রা	২৪
মুতার যুদ্ধ	২৫
মক্কা বিজয়	২৬
দলে দলে মানুষের ইসলাম গ্রহণ	২৭
বিদায় হাজ্জ	২৮
মৃত্যু শয্যায় রসূলুল্লাহ ﷺ	২৮
জীবনের শেষ ভাষণ	২৯
বিদায় হাজ্জের ভাষণে মানব কল্যাণের জন্য মুহাম্মাদ ﷺ এর শেষ নির্দেশ	৩১
মুহাম্মাদ ﷺ -এর নিকটতম বংশধরগণ	৩৩
মুহাম্মাদ ﷺ -এর পুত্র কন্যাগণ	৩৪

(রা.) = রাদিআল্লাহু আনহু বা আনহা

এই বইয়ে ব্রাকেটের মধ্যে সাহাবীদের নামের পাশে সংক্ষিপ্ত শব্দ (রা.) ব্যবহার করা হয়েছে। এটি দু'আর সংক্ষিপ্ত রূপ যার অর্থ "আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন"। পুরুষ সাহবী হলে 'আনহু' এবং মহিলা সাহাবী হলে 'আনহা'।

রসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্ম

রসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা নগরীতে বনু হাশিম বংশে ৫৭১ খৃষ্টাব্দের ২০/২২ এপ্রিল, ৯ই রবিউল আওয়াল সোমবার ভোরবেলায় জন্মগ্রহণ করেন। রসূলুল্লাহ ﷺ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাঁর মা দাদা আব্দুল মুত্তালিবকে এ সুসংবাদ প্রদান করেন। এ খবর পেয়ে তিনি অত্যন্ত খুশী হয়ে পরম আনন্দে তাঁকে কাবা ঘরে নিয়ে গিয়ে আল্লাহর দরবারে দু'আ এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করেন। অতঃপর তিনি তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মাদ। এ নাম আরবে অপরিচিত ছিল। এরপর আরবের নিয়ম অনুযায়ী সপ্তম দিনে নাতীর খতনা করান।

হাতীর ঘটনা

আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর পক্ষ থেকে আবরাহা সাবাহ হাবশী ইয়েমেনের গর্ভনর জেনারেল নিযুক্ত ছিল। আবরাহা লক্ষ্য করলো, আরবের লোকেরা কাবা ঘরে হাজ্জ পালনের জন্যে যাচ্ছে। এটা দেখে সে সানয়ায় (ইয়েমেনের রাজধানী) একটি গির্জা তৈরী করে। সে চাচ্ছিলো, আরবের লোকেরা হাজ্জ পালনের জন্যে মক্কায় না গিয়ে সানয়ায় যাবে। এ খবর জানার পর বনু কেনানা গোত্রের এক লোক রাতের বেলা আবরাহার তৈরী করা গির্জার ভেতর প্রবেশ করে গির্জার মেহরাবে মল ত্যাগ করে। আবরাহা এ খবর পেয়ে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে কাবা ঘর ধ্বংস করতে অগ্রসর হয়। আবরাহা হাতী নিয়ে মুযদালিফা এবং মিনার মধ্যবর্তী মোহাসসার প্রান্তরে পৌঁছলে আবরাহার হাতী বসে পড়ে। অনেক চেষ্টা করেও সেটিকে ওঠানো সম্ভব হয়নি। এ সময় আল্লাহ তা'আলা এক ঝাঁক চড়ুই পাখী পাঠালেন। পাখিগুলো আবরাহার সৈন্যদের উপর ছোটো ছোটো পাথরকণা নিক্ষেপ করে। এ পাথরকণা যার উপরই নিক্ষিপ্ত হয়েছে আল্লাহ তা'আলা তাকে চিবানো ঘাসের মতো করে দিয়েছেন। চড়ুই পাখীগুলো ছিলো আবাবিলের মতো। প্রতিটি পাখী তিনটি পাথর বহন করছিলো। একটি মুখে, অন্য দু'টি দু'পাখার নিচে। পাথরগুলো ছিলো মটরশুঁটির মতো। যার গায়ে সে পাথর পড়তো, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খসে পড়তে শুরু করতো এবং সে মরে যেতো। আবরাহার হাতের সব আঙ্গুল খসে পড়তে থাকে। সানআয় পৌঁছার পূর্বেই সে মৃত্যুবরণ করলো।

উল্লিখিত ঘটনা রসূল ﷺ -এর জন্মের ৫০/৫৫ দিন আগে মহররম মাস, ৫৭১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ বা মার্চ মাসের শুরুতে এ ঘটনাটি ঘটে।

দুধ পান

জন্মের পর মা আমিনা দুধ পান করান। মায়ের পর আবু লাহাবের দাসী সুওয়ায়বা তাঁকে দুধ পান করান। সে সময়ে সুওয়ায়বার কোলের শিশুর নাম ছিল মাসরুহ। তাঁর পূর্বে সুওয়ায়বা হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব এবং তার পরে আবু সালামা ইবনে আব্দুল আসাদ মাখযুমীকেও দুধ পান করিয়েছেন। তারপর দুই বছর হালিমা দুধ পান করান। তিনি ১ থেকে ৫ বছর হালিমার ঘরে অবস্থান করেন।

মায়ের স্নেহে ও দাদার আদরে

ছয় বছর বয়স পর্যন্ত তিনি মায়ের স্নেহ ছায়ায় কাটান। মা আমিনার ইচ্ছা হলো, তিনি মৃত স্বামীর কবর যিয়ারত করতে যাবেন। সেই ইচ্ছা পূরণের জন্য তিনি এক সময় পুত্র মুহাম্মাদ, দাসী উম্মে আয়মন এবং শ্বশুর আব্দুল মুত্তালিবকে সঙ্গে নিয়ে তিনি প্রায় পাঁচশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে মদীনায় পৌঁছেন। একমাস সেখানে অবস্থানের পর মক্কার পথে রওয়ানা হন। মদীনা থেকে রওয়ানা করে শুরুতেই তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি আবওয়া নামক জায়গায় এসে আমিনা ইন্তিকাল করেন।

মা আমিনার ইন্তিকালের পর দাদা আবদুল মুত্তালিব নাতীকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় পৌঁছলেন। পিতামাতাহীন নাতীকে তিনি নিজের সন্তানদের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন এবং বড়দের মতো সম্মান করতেন।

দাদার মৃত্যু

শিশু মুহাম্মাদ ﷺ -এর বয়স যখন আট বছর দু'মাস দশ দিন তখন দাদার স্নেহের ছায়াও ওঠে যায়। তিনি ইন্তি কাল করেন। মৃত্যুর আগে তিনি পুত্র আবু তালিবকে ওসিয়ত করে গেলেন, তিনি যেন ভ্রাতুষ্পুত্রের (ভায়ের ছেলে) বিশেষ যত্ন নেন। আবু তালিব এবং আব্দুল্লাহ ছিলেন একই মায়ের সন্তান।

চাচা আবু তালিবের স্নেহে শিশু মুহাম্মাদ

আবু তালিব তাঁর ভাইয়ের ছেলেকে গভীর স্নেহ ও মমতার সাথে লালন-পালন করেন। তিনি তাঁকে নিজ সন্ত ানদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। বরং সন্তানদের চেয়ে ভাতিজাকেই তিনি বেশি স্নেহ করতেন। চল্লিশ বছরের বেশি সময় পর্যন্ত তিনি প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে সহায়তা দেন। আবু তালিব তাঁর এ ভাইয়ের ছেলের প্রতি লক্ষ্য রেখেই মানুষের সাথে শত্রুতা ও বন্ধুত্ব স্থাপন করতেন।

সিরিয়ায় যাত্রা (ব্যবসার উদ্দেশ্যে)

মুহাম্মাদ ﷺ -এর বার বছর বয়সের সময় চাচা আবু তালিব তাকে সাথে নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশে সিরিয়ায় যাত্রা করেন।

খাদীজার (রা.) সাথে বিয়ে

রসূলুল্লাহ ﷺ বাণিজ্যিক সফর থেকে ফিরে আসার পর খাদীজা (রা.) নিজের সম্পদে এমন আমানত ও বরকত লক্ষ্য করেন, যা অতীতে কখনো করেননি। এছাড়া তিনি দাসী মায়সারার কাছে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর উন্নত চরিত্র, সততা এবং ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদির অনেক প্রশংসা শুনেন। এসব শুনে খাদিজা (রা.) রসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন।

সিরিয়া থেকে বাণিজ্যিক সফর শেষে ফিরে আসার দু'মাস পর এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। রসূল ﷺ বিয়ের মোহরানা হিসাবে বিশটি উট দিয়েছিলেন। এ সময় খাদীজা (রা.)-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। আর রসূল ﷺ বয়স ছিল পঁচিশ বছর। খাদীজা (রা.) তখন মক্কায় জ্ঞান, বুদ্ধি, সততা, সৌন্দর্য, ধন-সম্পদ এবং বংশ মর্যাদায় সেই সময়ের নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। খাদীজা (রা.)-এর সাথে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ বিয়েই ছিল তাঁর প্রথম বিয়ে। খাদীজা (রা.)-এর বেঁচে থাকাকালীন রসূলুল্লাহ ﷺ আর কোন বিয়ে করেননি।

ইব্রাহীম ব্যতীত রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সকল সন্তান খাদীজার (রা.) গর্ভে জন্মে ছিল। খাদীজা (রা.)-এর প্রথম সন্তান ছিলেন কাসিম। তার নামেই রসূল ﷺ -কে আবুল কাসিম বা কাসিমের পিতা বলা হতো। কাসিমের পর যায়নাব, রুকাইয়া, উম্মু কুলসুম, ফাতিমা (রা.) এবং আবদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। আবদুল্লাহর উপাধি ছিলো তাইয়্যিব ও তাহির। পুত্র সন্তান সকলেই শৈশবে ইন্তিকাল করেন। অবশ্যই কন্যারা সবাই ইসলামের যুগ পেয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ এবং হিজরতে অংশগ্রহণ করেন। ফাতিমা (রা.) ছাড়া অন্য সকলেই রসূলুল্লাহ ﷺ -এর বেঁচে থাকাকালীন ইন্তিকাল করেন। ফাতিমা (রা.) রসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তিকালের মাত্র ছ'মাস পর ইন্তিকাল করেন।

শিশুদের প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালোবাসা

- শিশুদের সাথে রসূল (সা.)-এর বড়ই মাখামাখি ছিল।
- শিশু দেখলেই তার মাথায় হাত বুলাতেন, আদর করতেন, দু'আ করতেন।
- একেবারে ছোট শিশু কাছে পেলে তাকে কোলে নিয়ে নিতেন।
- শিশুদের নাম রাখতেন।
- কখনো কখনো শিশুদেরকে লাইনে দাঁড় করিয়ে পুরস্কারের ভিত্তিতে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করাতেন যে, দেখবো কে আগে আমাকে ছুঁতে পারে। শিশুরা দৌড়ে আসতো।
- কেউ তার পেটের উপর আবার কেউ বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তো।
- শিশুদের সাথে হাসি তামাশা করতেন।

কাবা গৃহের পুনর্নির্মাণ এবং হাজরে আসওয়াদের বিরোধ মিমাংসা

রসূলুল্লাহ ﷺ -এর বয়স যখন ৩৫ বছর, সে সময় কুরাইশরা নতুন করে কাবা ঘর নির্মাণের কাজ শুরু করে। কাবা ঘরের নির্মাণ কাজে শুধু বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থই ব্যবহার করা হবে। অর্থের অভাব দেখা দেয়ায় তারা উত্তর দিকে কাবা ঘরের দৈর্ঘ্য ৬ হাত কমিয়ে দিল। এ অংশটিকে হিজর বা হাতীম বলা হয়। কাবা ঘরের দরজা অনেক উচুঁ করে দিল যাতে অনুমতিপ্রাপ্ত লোকই প্রবেশ করতে পারে। কাবা ঘর নির্মাণের সময় গোত্রসমূহের মধ্যে চরম সমস্যা দেখা দিল যে, কোন্ গোত্র হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) প্রতিস্থাপন করবে? অবশেষে আবু উমাইয়া মাখযুমী এ বিবাদ ফয়সালার একটা উপায় এভাবে নির্ধারণ করলেন, আগামীকাল ভোরবেলায় মসজিদে হারামের দরোজা দিয়ে যিনি প্রথম প্রবেশ করবেন, তার ফায়সালা সবাই মেনে নেবে। এ প্রস্তাব সবাই গ্রহণ করে। পরদিন ভোরে রসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন।

শেষ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান করলেন মুহাম্মাদ ﷺ। তিনি একখানা চাদর চেয়ে আনান এবং তা মাটিতে বিছিয়ে নিজ হাতে হাজারে আসওয়াদ চাদরের মাঝখানে রাখেন। তারপর বিরোধে লিপ্ত গোত্রসমূহের নেতাদের সে চাদরের কিনারা ধরে পাথর যথাস্থানে নিয়ে যেতে বললেন। তারা তাই করে। নির্ধারিত জায়গায় চাদর নিয়ে

যাওয়ার পর রসূল ﷺ নিজ হাতে পাথর যথাস্থানে স্থাপন করেন। এ ফায়সালা ছিলো অত্যন্ত বিবেকসম্মত এবং বুদ্ধিদৃপ্ত। বিরোধে লিপ্ত গোত্রগুলোর সকলেই এতে সন্তুষ্ট হয়, কারো কোন অভিযোগ রইলো না।

ওহী নিয়ে জিবরাঈল (আ.)-এর আগমন এবং নবুয়তলাভ

চল্লিশ বছর বয়স হচ্ছে মানুষের পূর্ণতা ও পরিপক্কতার বয়স। নাবী-রসূলগণ এ বয়সেই ওহী লাভ করে থাকেন। রসূলুল্লাহ ﷺ -এর বয়স চল্লিশ বছর হওয়ার পর তাঁর জীবনে নবুয়তের নিদর্শন আসতে থাকে। এ নিদর্শন প্রকাশ পাচ্ছিলো স্বপ্নের মাধ্যমে। এ সময় রসূল ﷺ যে স্বপ্নই দেখতেন, সে স্বপ্ন শুভ্র সকালের মতো প্রকাশ পেতো। এ অবস্থায় ছয় মাস কেটে গেলো। নবুয়তের মোট সময়কাল হচ্ছে তেইশ বছর।

রসূল (সা.)-এর স্বভাব চরিত্র

- তিনি সবার চেয়ে ন্যায়পরায়ণ, দানশীল ও বীর ছিলেন।
- সারা জীবনেও কাউকে কোন কষ্ট দেননি।
- অন্যদের অত্যাচারের কোন প্রতিশোধ নেননি।
- সবাইকে সবসময় ক্ষমা করে দিয়েছেন।
- তিনি জীবনে কোনদিন মিথ্যা কথা বলেননি।
- জীবনে কোনদিন কোন অন্যায় করেননি।

হেরা গুহায় নির্জন বসবাসের তৃতীয় বছরে মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলকে নবুয়ত দান করেন। ফিরিশতা জিবরাঈল (আ.) সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াতসহ উপস্থিত হলেন। "পড়ো তোমার সেই প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাটবাঁধা রক্ত থেকে। পড়ো, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন- শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।" (সূরা আলাক ঃ ১-৫)।

প্রথম ওহী নিয়ে আগমনের দিন ছিল রমাদান মাসের ২১ তারিখ সোমবার রাতে। এ দিনটা ছিলো ৬১০ খৃষ্টাব্দের ১০ আগষ্ট সোমবার। চাঁদের মাসের হিসাব অনুযায়ী এ সময় রসূল ﷺ -এর বয়স হয়েছিলো ৪০ বছর ৬ মাস ১২ দিন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, রমাদান মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে। আরও বলেছেন, লাইলাতুল ক্বদরে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। রসূল ﷺ -কে সোমবার দিন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন, এ দিনটিতে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এ দিনেই আমাকে নবুয়ত দান করা হয়েছে। (সহীহ মুসলিম)।

লাইলাতুল ক্বদর রমাদান মাসের বেজোড় রাতেই রয়েছে।

রসূল ﷺ বলেছেন, আমি পথ চলছিলাম। হঠাৎ আকাশ থেকে একটি শব্দ শোনা গেল। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি সেই ফিরিশতা যিনি হেরা গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন। তিনি আসমান যমীনের মাঝখানে একখানি চেয়ারে বসে আছেন। আমি ভয় পেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। বাড়ি গিয়ে আমার স্ত্রীকে বললাম আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও। এরপর আল্লাহ নাযিল করেন –

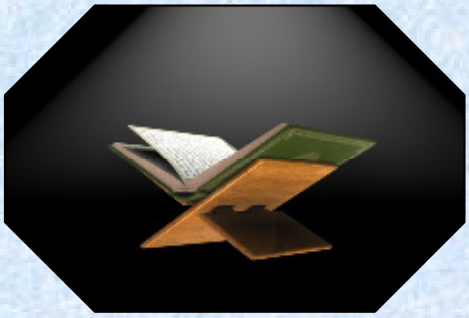

"হে বস্ত্রাবৃত! ওঠ সাবধান কর, তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, বস্ত্র পবিত্র রাখ।" (সূরা মুদ্দাসসির ঃ ১-৪)

দাওয়াতের কাজে কষ্ট শ্রম

গোপন দাওয়াতের তিন বছর

মক্কা ছিল আরববাসীর দ্বীনি কেন্দ্র। আরবরা কাবাঘরের দেখাশুনা করত এবং মূর্তিরও দেখাশুনা করত। যাদেরকে সারা আরববাসী মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখত। এ কারণে অন্য সব স্থানের চেয়ে মক্কায় মূর্তির বিরুদ্ধে সংস্কার প্রচেষ্টা সফল হওয়া ছিল বেশী কষ্টকর। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে কৌশল হল, দাওয়াতের কাজ প্রথমে গোপনীয়ভাবে সম্পন্ন করা, যাতে মক্কাবাসীদের সামনে হঠাৎ কোনো কোলাহল সৃষ্টি না হয়।

ইসলামের প্রথম সারির কিছু সৈনিক

রসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম তাদেরই কাছে দ্বীনের দাওয়াত দেন, যাদের সাথে রয়েছে তাঁর গভীর সম্পর্ক, এটাই স্বাভাবিক। নাবী কারীম ﷺ প্রথমে তাঁর পরিবারের লোকজন এবং বন্ধু বান্ধবদের আগে ইসলামের দাওয়াত দেন।

অতঃপর তিনি যাদের ইসলামের দাওয়াত দেন, তাদের মধ্য থেকে এমন একদল মানুষ তাঁর দাওয়াত কবুল করেন, যাদের মনে কখনোই রসূল ﷺ -এর সম্মান মর্যাদা, সততা, সত্যবাদিতা সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ জাগেনি। ইসলামের ইতিহাসে এরা প্রথম অগ্রবর্তী দল নামে পরিচিত। তাদের মধ্যে শীর্ষ তালিকায় রয়েছেন রসূল ﷺ -এর স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রা.), তাঁর মুক্ত করা ক্রীতদাস যায়িদ ইবনে সাবেত (রা.)। তাঁর চাচাতো ভাই আলী ইবনে আবু তালিব (রা.), যিনি ছিলেন সে সময় তাঁর পরিবারে প্রতিপালিত বালক এবং হিজরতকালে তাঁর গুহার সাথী ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবু বকর সিদ্দিক (রা.)। তারা সবাই প্রথম দিনেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন সকলের প্রিয় নরম মেজায, উত্তম চরিত্র এবং উদার মনের মানুষ। তাঁর চমৎকার ব্যবহারের জন্য সব সময় তাঁর কাছে মানুষ যাওয়া-আসা করতো। এ সময় বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য লোকদের নিকট আবু বকর (রা.) দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করতে শুরু করেন। তার চেষ্টায় ওসমান (রা.), জুবাইর (রা.), আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.), সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.), তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা.) প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। এরা ছিলেন ইসলামের প্রথম সারির সৈনিক।

সলাতের আদেশ

প্রথমে যা কিছু নাযিল হয় তাতে সলাতের আদেশও ছিলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা সকাল এবং সন্ধ্যায় তোমাদের রবের প্রশংসার সাথে সাজদাহ কর।"

রসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা.) সলাতের সময়ে পাহাড়ে চলে যেতেন এবং গোপনে সলাত আদায় করতেন। একবার আবু তালিব রসূলুল্লাহ ﷺ এবং আলী (রা.)-কে সলাত আদায় করতে দেখে ফেলেন। তিনি এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তাঁকে জানানোর পর তিনি বলেন, এ অভ্যাস চালু রেখো।

হাবশায় হিজরত (ইংলিশ নাম আবিসিনিয়া)

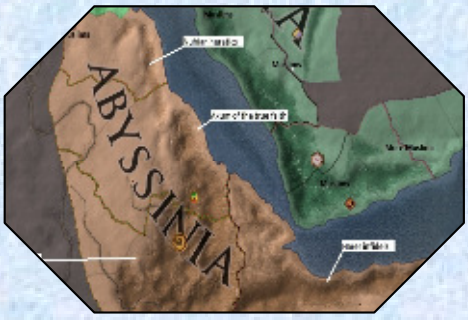

ইসলাম প্রচারের কারণে মুসলিমদের উপর যুলুম অত্যাচার ও নির্যাতন নিপীড়নের এ ধারা নবুয়তের চতুর্থ বছরের মাঝামাঝি বা শেষদিকে শুরু হয়েছিলো। প্রথমদিকে ছিল সহনীয় পর্যায়, কিন্তু দিনে দিনে এর তীব্রতা বাড়তে থাকে। নবুয়তের পঞ্চম বছরের মাঝামাঝি সময়ে তা চরমে পৌঁছে। ফলে মুসলিমদের মক্কায় অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

সূরা যুমায় হিজরতের প্রতি ইশারা করে বলা হয়েছে, আল্লাহর যমীন সংকীর্ণ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, বলো, 'যারা এ দুনিয়ায় কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্যে আছে কল্যাণ, আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত, ধৈর্যশীলদের অগণিত পুরষ্কার দেয়া হবে।'

রসূল ﷺ -এর জানতেন যে হাবশার বাদশাহ আসহামা নাজ্জাশী একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক। তার রাজ্যে কারো ওপর যুলুম অত্যাচার হয় না। এ কারণে আল্লাহর রসূল ﷺ মুসলিমদেরকে দ্বীনের হিফাযতের জন্যে হাবশায় হিজরত করার আদেশ দেন। এরপর পরিকল্পনা অনুযায়ী রজব মাসে সাহাবাদের প্রথম দল হাবশার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। এ দলে বারো জন পুরুষ এবং চারজন মহিলা ছিলেন। ওসমান (রা.) ছিলেন তাদের দলনেতা। এ দলে রসূল ﷺ -এর কন্যা রোকাইয়া (রা.)-ও ছিলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের সম্পর্কে বলেন, 'ইবরাহীম (আ.) এবং লূত (আ.) এরপর তারা আল্লাহর পথে হিজরতকারী প্রথম পরিবার।' দ্বিতীয় বার আম্মার (রা.)-এর নেতৃত্বে ৮২/৮৩ জন হিজরত করেন তার মধ্যে ছিল ১৮/১৯ জন মহিলা।

রসূল ﷺ -এর কথা বার্তা

- তিনি মনগড়া কিছু বলতেন না।
- কথা বলার সময় প্রতিটি শব্দ ধীরে ধীরে ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতেন, যে তা শুনতো সে তা সহজেই মুখস্থ করে ফেলতো।
- প্রয়োজনের চেয়ে কথা বেশী বলতেন না, কমও বলতেন না। বেশী সংক্ষিপ্তভাবেও বলতেন না, অতিরিক্ত লম্বা করেও বলতেন না।
- কথার উপর জোর দেয়া, বুঝানো এবং মুখস্থ করার সুবিধার্থে বিশেষ বিশেষ কথা ও শব্দকে তিনবার করে উচ্চারণ করতেন।
- অশোভন, অশ্লীল ও নির্লজ্জ ধরনের কথাবার্তাকে ঘৃণা করতেন। কথাবার্তার সাথে সাধারণত একটি মুচকি হাসি উপহার দিতেন।
- কোন কথা বুঝানোর ব্যাপারে হাত ও আঙ্গুলের ইশারা দিয়েও সাহায্য নিতেন।

হামযা (রা.) এবং ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ

নবুয়তের ষষ্ঠ বছরের যিলহাজ্জ মাসে রসূল ﷺ এর চাচা হামযা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। হামযা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের তিন দিন পর ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। রসূল ﷺ ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের জন্যে দু'আ করেছিলেন।

সর্বাত্মক বয়কট

চার সপ্তাহ বা তার চেয়ে কম সময়ের ভেতর মুশরিকরা চারটি বড় ধরনের ধাক্কা খায়। হামযা (রা.) ও ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব সম্মিলিতভাবে রসূল ﷺ -এর হিফাজতের ব্যাপারে একমত হল। এতে মুশরিকরা অস্থির হয়ে ওঠে, আর তাদের অস্থির হওয়ারও কথা, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে, যদি

তারা মুহাম্মাদ ﷺ -কে হত্যার পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে তাঁকে রক্ষা করতে যে রক্তপাত হবে, এতে মক্কার ভূমি মুশরিকদের রক্তে লাল হয়ে যাবে; বরং তাদের পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে তারা আল্লাহর রসূল ﷺ -কে হত্যার পরিকল্পনা ত্যাগ করে অত্যাচার নির্যাতনের আরেক পথ আবিষ্কার করে, যা ছিল আগের সকল পদক্ষেপ হতে আরো বেশী মারাত্মক।

কাফিররা একত্র হয়ে বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিবের প্রতি অংগীকারবদ্ধ হয় যে তারা এদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না, বেচাকেনা করবে না, তাদের সাথে ওঠাবসা করবে না, মেলামেশা রাখবে না, তদের ঘরে যাবে না, তাদের সাথে কথাবার্তা বলবে না, যতোক্ষণ না বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিব রসূল ﷺ -কে হত্যার উদ্দেশে তাদের হাতে সমর্পণ না করবে।

এ অংগীকারের দলিল লিখে কাবা ঘরের অভ্যন্তরে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়। এর পরিণামে আবু লাহাব ব্যতীত বনু হাশিম এবং বনু মুত্তালিবের মুসলিম-অমুসলিম, নারী-পুরুষ-শিশু সবাই শা'বে আবু তালিবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এটা ছিল নবুয়তের সপ্তম বছর মহররম মাসের ঘটনা।

শাবি (উপত্যকা) আবু তালিবে তিন বছর অবস্থান

এ বয়কটে পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে ওঠে। খাদ্যসামগ্রীর সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। মক্কায় বাইরে থেকে যে খাদ্যশস্য আসতো, মুশরিকরা ছুটে এসে সেগুলো কিনে নিতো। ফলে অবরুদ্ধদের অবস্থা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। গাছের পাতা এবং চামড়া খেয়ে তাদের জীবন ধারণ করতে হয়। ক্ষুধার কষ্ট এতো মারাত্মক ছিলো যে, নারী ও শিশুদের তীব্র কান্নার আওয়ায আবু তালিব ঘাঁটির বাইরে থেকে শোনা যেতো। অতি কষ্টে তাদের কাছে কোনো খাদ্যসামগ্রী পৌঁছতো। এ ধরনের কঠিন অবরোধ সত্ত্বেও রসূল ﷺ এবং অন্যান্য মুসলিম হাজ্জের সময় বাইরে বের হতেন এবং হাজ্জের উদ্দেশে আসা লোকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতেন।

এ অবস্থায় নবুয়তের ৭ম থেকে ১০ম পুরো তিন বছর কেটে যায়। এরপর নবুয়তের দশম বর্ষের মহররম মাসে দলিল ছিন্ন হওয়ার ঘটনা সংঘটিত হয়। এতে অত্যাচার নির্যাতনের অবসান ঘটে। কুরাইশদের মধ্যেকার কিছু লোক এ ব্যবস্থার বিরোধী থাকার কারণে তারা অবরোধ তুলে নিতেও উদ্দোগী হয়।

সকাল বেলা নিয়মানুযায়ী সবাই নিজ নিজ মজলিসে একত্রিত হন। যুহাইর দামী পোশাক পরিধান করে সেজেগুজে আসেন। তিনি প্রথমে সাতবার কাবা ঘর তাওয়াফ করে সকলকে সম্বোধন করে বললেন, মক্কাবাসীরা শোনো, আমরা পানাহার করবো, পোশাক পরিধান করবো, আর বনু হাশিম ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের কাছে কিছু বিক্রি করা হচ্ছে না, তাদের থেকে কেনাও হচ্ছে না। আল্লাহর কসম, এ ধরনের আত্মীয়তা ছিন্নকারী অমানবিক দলিল বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আমি নীরব হয়ে থাকতে পারি না। আমি চাই এ দলিল বিনষ্ট করে ফেলা হোক।

আবু জাহিল এ কথা শুনে বললো, তুমি ভুল বলছো। আল্লাহর কসম, এ দলিল ছিন্ন করা যেতে পারে না। যামযা ইবনে আসওয়াদ বললেন, আল্লাহর কসম, তুমি ভুল বলছো। এ দলিল যখন লেখা হয়েছিল, তখনো আমরা এতে সম্মত ছিলাম না। আমরা এটা মানতে রাজী নই। এরপর মোতয়াম ইবনে আদী বললেন, তোমরা দু'জনে ঠিকই বলছো। এ দলিলে যা কিছু লেখা রয়েছে, আমরা তা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।

এ অবস্থা দেখে আবু জাহিল বলল, হুঁহ বুঝেছি, রাতের বেলাই এ ধরনের ঐক্যমত্য হয়েছে। এ পরামর্শ এখানে নয়, বরং অন্য কোথাও করা হয়েছে।

সে সময় চাচা আবু তালিবও হারাম শরীফের এক কোণে উপস্থিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জানিয়েছিলেন, দলিল বিনষ্ট করতে আল্লাহ তা'আলা এক রকম পোকা পাঠিয়েছেন। পোকাগুলো যুলুম অত্যাচারের বিবরণসমূহ কেটে ছারখার করে ফেলেছে, শুধু যেখানে যেখানে আল্লাহর নাম ছিলো তাই অবশিষ্ট রয়েছে।

আবু তালিব কুরাইশদের বলতে এসেছেন, তার ভাতিজা তাকে খবর দিয়েছেন, পোকা বয়কট দলিল কেটে ফেলেছে। আবু তালিব আরো বলেন, এ কথা মিথ্যা প্রমাণিত হলে আমরা তার ও তোমাদের মাঝ থেকে সরে দাঁড়াবো, তখন তোমরা যা ইচ্ছা তাই করো। আর যদি সে সত্য প্রমাণিত হয় তাহলে তোমাদের এ যুলুম অত্যাচার থেকে বিরত হতে হবে। আবু তালিবের কথায় কুরাইশরা বললো, আপনি ইনসাফপূর্ণ কথাই বলেছেন।

এ নিয়ে আবু জাহিল ও অন্যান্যদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক শেষ হলে মুতয়া'ম বিন আদী অংগীকারপত্র ছিঁড়তে গিয়ে দেখেন, আল্লাহর নাম লেখা অংশ ছাড়া বাকি অংশ সত্যি সত্যি পোকায় খেয়ে ফেলেছে। পরে অংগীকারপত্র ছিঁড়ে ফেলা হলে বয়কটের অবসান হয় এবং রসূলুল্লাহ ﷺ ও অন্য সকলে শাবি আবু তালিব থেকে বেরিয়ে আসেন। কাফিররা নবুয়তের এক মহা নিদর্শন দেখে বিস্মিত হয়, কিন্তু তাদের মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তারা কোন মোজেযা দেখলে টালবাহানা করে এবং বলে, এ তো যাদু।" (সূরা ক্বামার ঃ ২)

অতএব, মুশরিকরা নবুয়তের বিস্ময়কর এ নিদর্শন থেকেও মুখ ফিরিয়ে কুফরীর পথে আরো কয়েক ধাপ অগ্রসর হয়।

রসূল (সা.)-এর বক্তৃতার নমুনা

- এ কথা কি সত্য নয় যে, তোমরা প্রথমে পথভ্রষ্ট ছিলে;
- অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের সুপথে পরিচালিত করলেন?
- তোমরা কতটা বিচ্ছিন্ন ছিলে;
- আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন?
- তোমরা দরিদ্র ছিলে;
- আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের স্বচ্ছল বানিয়েছেন?
- (প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে আনসারগণ বলছিলেন, নিঃসন্দেহে আমাদের উপর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনেক দান রয়েছে।) (সহীহ বুখারী)

শোক-দুঃখের বছর

আবু তালিবের ইন্তিকাল

আবু তালিব অবরোধ থেকে মুক্ত হওয়ার ছয়মাস পর নবুয়তের দশম বর্ষে রজব মাসে মৃত্যুবরণ করেন। আবু তালিবের মৃত্যুবরণের দু'মাস অথবা শুধু তিনদিন পর উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) ইন্তিকাল করেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, খাদীজা (রা.)-এর ইন্তিকালের তিনদিন আগে রমাদান মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।

খাদীজা (রা.)-এর ইন্তিকাল

আবু তালিবের ইন্তিকালের দু'মাস অথবা শুধু তিনদিন পর উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রা.) ইন্তিকাল করেন। নবুয়তের দশম বর্ষের রমাদান মাসে তাঁর ইন্তিকাল হয়। সে সময় তার বয়স ছিলো ৬৫ বছর, আর রসূলুল্লাহ ﷺ -এর বয়স পঞ্চাশে পড়েছিলো।

রসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্যে খাদীজা (রা.) ছিলেন আল্লাহর এক বিশিষ্ট নিয়ামত। পঁচিশ বছর পর্যন্ত তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবনসঙ্গিনী ছিলেন। এ সুদীর্ঘ সময় দুঃখে কষ্টে ও বিপদে আপদে প্রিয় স্বামীর পাশে থাকতেন, বিপদের সময় তাঁকে ভরসা দিতেন, দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গী হতেন। নিজ জানমাল দিয়েও তাঁর দুঃখ-কষ্ট দূর করতেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে সময় মানুষ আমার সাথে কুফুরী করেছিলো, সে সময় খাদীজা আমার উপর ঈমান এনেছিলেন, যে সময় লোকেরা আমাকে অবিশ্বাস করেছিলো তখন খাদীজা আমাকে সত্যবাদী বলে গ্রহণ করেছেন, যে সময় লোকেরা আমাকে বঞ্চিত করেছিল, সে সময় তিনি আমাকে স্বীয় ধন-সম্পদের অংশীদার করেছেন। তাঁর গর্ভ থেকে আল্লাহ আমাকে সন্তান দান করেছেন। অন্য স্ত্রীদের গর্ভ থেকে আমাকে কোন সন্তান দেননি।

তায়েফে রসূল ﷺ -এর ইসলামের দাওয়াত

নবুয়তের দশম বর্ষের শুরুতে ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের শেষ দিকে অথবা জুন মাসের প্রথম দিকে নাবী কারীম ﷺ তায়েফ গমন করেন। তায়েফ মক্কা থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরে অবস্থিত। তিনি পায়ে হেঁটে তায়েফে আসা যাওয়া করেছেন। এ সময় সাথে তাঁর মুক্ত করা ক্রীতদাস যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) ছিলেন। তায়েফ যাওয়ার পথে তিনি যে গোত্রের কাছ দিয়েই অতিক্রম করতেন, সে গোত্রের লোকদেরই ইসলামের দাওয়াত দিতেন, কিন্তু কেউই তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেনি।

রসূলুল্লাহ ﷺ তায়েফে দশদিন অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি তায়েফের সকল গোত্রের নেতাদের নিকট গমন করেন এবং প্রত্যেককে দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করেন। কিন্তু সবারই একই জবাব, তুমি আমাদের শহর থেকে বেরিয়ে যাও। শুধু এ কথা বলেই তারা বিরত হয়নি; বরং তারা উচ্ছৃঙ্খল বালকদের উসকে দেয়। তিনি ফেরার ইচ্ছা করলেই ওইসব দুর্বৃত্ত (দুষ্টস্বভাব) বালক তাঁকে গালি দিতো, তালি বাজাতো। এভাবে দুর্বৃত্ত বালকগুলো তাঁর পেছনে লাগে। অল্পক্ষণের মধ্যে এত বালক এবং দুর্বৃত্ত লোক জড়ো হলো যে, পথের দু' পার্শ্বে জড়ো হয়ে গেলো। এরপর গালাগাল দিতে ও ঢিল ছুঁড়তে আরম্ভ করলো, এতে তাঁর দু'পা রক্তাক্ত হয়ে তাঁর জুতো রক্তে পূর্ণ হয়ে গেলো। যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.) ঢাল হিসেবে নাবী কারীম ﷺ -কে আগলে রাখছিলেন।

আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওহুদের দিনের চেয়ে মারাত্মক কোন দিন আপনার জীবনে এসেছিলো কি? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, তোমার কওম থেকে আমি যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ দিন ছিল তায়েফের দিন। আমি আবদে ইয়ালিল ইবনে আবদের কুলাল সন্তানদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা আমার দাওয়াত কবূল করেনি। আমি দুঃখ-কষ্ট ও মানসিক বিপর্যস্ত অবস্থায় 'কারনে সাআলেবে' উপনীত হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। সেখানে মাথা তুলে দেখি মাথার উপরে এক টুকরো মেঘ। ভালোভাবে তাকিয়ে দেখি সেখানে জিবরাঈল (আ.)। তিনি আমাকে বললেন, আপনার কওম আপনাকে যা যা বলেছে, আল্লাহ তা'আলা তার সবই শুনেছেন। আপনার নিকট পাহাড়ের ফিরিশতাদের প্রেরণ করা হয়েছে। এরপর পাহাড়ের ফিরিশতারা আমাকে সালাম জানালেন, এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ কথা সত্যই। আপনি চাইলে আমরা ওদেরকে দু পাহাড়ের মধ্যে পিষে দেব। নাবী কারীম ﷺ বললেন, না, আমি আশা করি আল্লাহ তা'আলা ওদের বংশধরদের মধ্যে এমন

মানুষ সৃষ্টি করবেন, যারা কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। (সহীহ বুখারী)

আল্লাহর রসূল ﷺ -এর এ জবাবে তাঁর দুরদর্শিতা, বিচক্ষণতা, অনুপম ব্যক্তিত্ব ও উত্তম মানবিক চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। মোটকথা, আসমানের উপর থেকে আসা গায়েবী সাহায্যে তাঁর মন শান্ত হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার পথে পা বাড়ান এবং ওয়াদীয়ে নাখলা নামক স্থানে এসে তিনি থামেন। এখানে তাঁর অবস্থানের মতো স্থান ছিল দু'টি। এক জায়গার নাম 'আসসাইলুল কাবীর', অন্য জায়গা হলো 'যায়মা'।

নাখলায় আল্লাহর রসূল ﷺ কয়েকদিন অবস্থান করেন। সেখানে আল্লাহ রব্বুল 'আলামিন জিনদের দু'টি দল তাঁর কাছে প্রেরণ করেন। পবিত্র কুরআনের দু'টি জায়গায় - সূরা আহকাফ এবং সূরা জিনের উল্লেখ রয়েছে।

"স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করেছিল। যখন ওরা তার নিকট হাজির হল, ওরা পরস্পর পরস্পরকে বলতে লাগল, চুপ করে শোন। যখন পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত শেষ হল তখন ওরা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল এক একজন সাবধানকারীরূপে। এমন এক গ্রন্থের পড়া শুনেছি, যা নাযিল হয়েছে মূসা (আ.) এর উপর। এটি পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের জাতি! আমাদের দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি ঈমান আন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে তোমাদের বাঁচাবেন।" (সূরা আহকাফ ঃ ২৯-৩১)

"বল, আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনযোগ সহকারে শ্রবণ করে বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথ নির্দেশ করে, ফলে আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আমরা কখনো আমাদের রবের কোন শরীক স্থির করব না।" (সূরা জিন ঃ ১-২)

সালামের প্রচলন করেছিলেন

- তাঁর রীতি ছিল পথে যার সাথে দেখা হোক প্রথমে সালাম দেয়া।
- কাউকে কোন খবর দিতে হলে সেই সাথে সালাম পাঠাতে ভুলতেন না।
- তাঁর কাছে কেউ কারো সালাম পৌঁছালে সালামের প্রেরক ও বাহক উভয়কে পৃথক পৃথকভাবে সালাম দিতেন।
- বাড়ীতে প্রবেশকালে ও বাড়ী থেকে বেরুবার সময় পরিবার পরিজনকে সালাম দিতেন।
- বন্ধুবান্ধবদের সাথে হাতও মিলাতেন, আলিঙ্গণও করতেন। হাত মিলানোর পর অপর ব্যক্তি হাত না সরানো পর্যন্ত তিনি হাত সরাতেন না।

রসূলুল্লাহ ﷺ -এর মি'রাজ

নাবী কারীম ﷺ -এর দাওয়াতের সাফল্য এবং তাঁর এবং ইসলামের অনুসারীদের প্রতি যুলুম নির্যাতন মাঝামাঝি পর্যায়ে চলছিলো, আর দূর দিগন্তে মিটিমিটি জ্বলছিল নক্ষত্রের আলো। এমনি সময়ে মিরাজের ঘটনা ঘটে। খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যু মিরাজের আগেই হয়েছিল। তাঁর মৃত্যু নবুয়তের দশম বর্ষের রমাদান মাসে হয়েছে বলে জানা যায়। সুতরাং মিরাজের ঘটনা এর পরেই ঘটেছে, আগে নয় এবং মক্কী জীবনের একেবারে শেষ দিকে সংঘটিত হয়েছে।

নাবী সাইয়েদুল মুরসালিন ﷺ -কে সশরীরে বোরাকে তুলে জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে মাসজিদে হারাম থেকে বায়তুল মাকদাস (ইসরাইলের জেরুজালেম) পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়। তিনি এখানে অবতরণ করেন আর মাসজিদের দরজার কড়ার সাথে বোরাক বেঁধে রাখেন এবং সকল নাবীর ইমাম হয়ে সলাত আদায় করেন। সলাত শেষে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) মদ ও দুধ নিয়ে এলে নাবী ﷺ দুধের পাত্রটি বেছে নেন।

এরপর সে রাতেই তাঁকে বায়তুল মাকদাস থেকে প্রথম আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। জিবরাঈল (আ.) দরজা খোলেন। নাবী কারীম ﷺ সেখানে মানব জাতির আদি পিতা আদম (আ.)-কে দেখে সালাম করেন। এরপর দ্বিতীয় আসমানে ইয়াহিয়া ইবনে যাকারিয়া (আ.) এবং ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.)-কে দেখে সালাম করেন। নাবী কারীম ﷺ এরপর চতুর্থ আসমানে ইদরিস (আ.), পঞ্চম আসমানে হারুন (আ.) এবং ষষ্ঠ আসমানে মূসা (আ)-কে দেখে সালাম করেন। এ সময় মূসা (আ.) কাঁদতে লাগলেন। এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, একজন যুবক, যিনি আমার পরে নাবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, তাঁর উম্মত আমার উম্মতদের চেয়ে বেশি সংখ্যায় জান্নাতে যাবে।

এরপর নাবী কারীম ﷺ -কে সপ্তম আসমানে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে তাঁর দেখা হয়। তিনি তাঁকে সালাম করেন। তিনি সালামের জবাব দেন, মোবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুয়তের স্বীকারোক্তি করেন। এরপর নাবী কারীম ﷺ -কে 'সিদরাতুল মুনহাতা' (সপ্তম আসমান) পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়, অতঃপর তাঁর জন্যে বায়তুল মামুর প্রকাশ করা হয়। এখানে আল্লাহ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করার আদেশ দিয়েছেন।

নাবী কারীম ﷺ জিবরাঈল (আ.)-কে তার আসল চেহারায় দু'বার দেখেছেন। একবার পৃথিবীতে এবং অন্যবার 'সিদরাতুল মুনতাহা'র কাছে। জিবরাঈল (আ.)-কে সিদরাতুল মুনতাহায় আসল চেহারায় দেখেছেন (৬০০ ডানা বিশিষ্ট)।

মিরাজের সফরে রসূল ﷺ জান্নাতে ৪টি নহর দেখেন। ২টি যাহেরী (প্রকাশ্য), আর ২টি বাতেনী (অপ্রকাশ্য)। প্রকাশ্য নহর ছিল নীল ও ফোরাত। সম্ভবত এর তাৎপর্য হচ্ছে, তাঁর রিসালত নীল এবং ফোরাতের সজীব এলাকাকে নিজের দেশ বানাবে। এখানকার অধিবাসীরা বংশ পরম্পরায় মুসলিম হবে। এমন নয় যে, এ দু'টি নহরের পানির উৎস জান্নাতে রয়েছে।

তিনি জাহান্নামের দারোগা মালেককে দেখেন। তিনি হাসেন না, তার চেহারায় হাসিখুশীর কোন ছাপও নেই। এ সফরে আল্লাহর রসূল ﷺ জান্নাত জাহান্নামও দেখেন।

এতিমের ধনসম্পদ যারা অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে, নাবী কারীম ﷺ মিরাজে তাদেরও দেখেন। তাদের ঠোঁট ছিলো উটের ঠোঁটের ন্যায়। তারা নিজেদের মুখে পাথরের টুকরোর ন্যায় অঙ্গার প্রবেশ করাচ্ছে, যা পায়খানার রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

নাবী কারীম ﷺ সুদখোরদেরও দেখেছিলেন। তাদের পেট এতো বড় ছিল যে, তারা নড়াচাড়া করতে পারছিলো না। ফিরাউনের অনুসারীদের জাহান্নামে নেয়ার সময় তারা এসব সুদখোরকে মাড়িয়ে যাচ্ছিলো।

যিনাকারীদেরও তিনি দেখেছিলেন। তাদের সম্মুখে তাজা গোশত এবং দুর্গন্ধময় পচা গোশত ছিল যে, তারা তাজা গোশত রেখে পচা গোশত আহার করছিল।

আল্লাহ তা'আলা এসব দেখানোর যে উদ্দেশ্য, তাও বলে দিয়েছেন। তা হচ্ছে, নাবীরা আল্লাহর নিদর্শন সরাসরি প্রত্যক্ষ করার তাদের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়। ফলে তাঁরা আল্লাহর পথে মানুষকে দাওয়াত প্রদান করতে এমন সব দুঃখ কষ্ট এবং নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করতে পারেন, যা অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

রসূলুল্লাহ ﷺ -এর হিজরত

রসূলে কারীম ﷺ -কে হত্যা করার জঘন্য প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর জিবরাঈল (আ.) ওহী নিয়ে হাযির হন এবং কুরাইশদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করে বলেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মক্কা থেকে হিজরতের অনুমতি দিয়েছেন। হিজরতের অনুমতির কথা জানানোর সাথে সাথে জিবরাঈল (আ.) এর সময়ও নির্ধারণ করে দিয়ে বললেন, আপনি এ পর্যন্ত যে বিছানায় শয়ন করে আসছেন, আজ রাতে সে বিছানায় শয়ন করবেন না।

এ খবর পাওয়ার পর নাবী কারীম ﷺ ঠিক দুপুরের সময় আবু বকর (রা.)-এর বাড়ীতে গমন করেন। হিজরতের অনুমতি পাওয়ার সংবাদ জানানোর জন্য আবু বকরের (রা.) বাড়ীতে গমন করেন। আয়িশা (রা.) বলেন, ঠিক দুপুরের সময় আমরা আবু বকর (রা.) এর ঘরে বসেছিলাম, এমন সময় একজন আবু বকর (আ.)-কে বললেন, আল্লাহর নাবী ﷺ মাথা ঢেকে এদিকে আসছেন। এ সময়ে রসূলুল্লাহ ﷺ কখনো আগমন করতেন না। আবু বকর (রা.)-এ সংবাদ শুনে বললেন, আমার মা-বাবা তাঁর জন্যে কুরবান হোন। নিশ্চয়ই এ সময় তিনি গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজেই আসছেন।

আয়িশা (রা.) বলেন, প্রিয় নাবী ﷺ আগমন করে ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। অনুমতি দেয়া হলে তিনি ঘরে প্রবেশ করেন। এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার কাছে যারা রয়েছে তাদের সরিয়ে দাও। আবু বকর (রা.) বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ ﷺ এখানে যারা আছে তারা তো আপনার ঘরের লোক। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমাকে হিজরতের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। আবু বকর (রা.) নাবী কারীম ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! সঙ্গে কি আমি আছি? আপনার উপর আমার মা-বাবা কুরবান হোন, হে আল্লাহর রসূল! প্রিয় রসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ। এরপর হিজরতের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নিজের গৃহে ফিরে রাত আগমনের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ঘর হতে গারে ছুরে (পাহাড়)

রসূলুল্লাহ ﷺ নবুয়তের এয়োদশ বছর, ২৭শে সফর মুতাবেক ১২, ১৩ই সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ ১২ই সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে হিজরত করেন। তাঁর সফরসঙ্গী ছিল তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত সাথী আবু বকর (রা.)। তাঁরা সূর্যোদয়ের আগেই মক্কার সীমানা অতিক্রম করার উদ্দেশে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে চললেন।

ছুর পাহাড়ের গুহায়

গুহার কাছে পৌঁছে আবু বকর (রা.) রসূল ﷺ বললেন, একটু অপেক্ষা করুন। তিনি গুহায় প্রবেশ করে তা পরিষ্কার করেন। কিছু গর্ত ছিলো, যেগুলো পরনের লুংগি ছিঁড়ে বন্ধ করেন, দু'টি গর্ত বাকি ছিলো, সেগুলোতে পা চাপা দিয়ে রসূল ﷺ -কে ভেতরে আসার আহ্বান জানান। তিনি ভেতরে গিয়ে আবু বকরের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে আবু বকর (রা.)-কে কিসে যেন দংশন করে, আবু বকরের (রা.) চোখের পানি রসূল ﷺ এর চেহারায় পড়লে তিনি জেগে ওঠেন। আবু বকর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে? আবু বকর (রা.) বললেন, কিসে যেন দংশন করেছে। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ খানিকটা থুতু নিয়ে দংশিত স্থানে লাগিয়ে দেন। সাথে সাথে বিষের যাতনা দূর হয়ে যায়।

এখানে তাঁরা শুক্র, শনি ও রবিবার এ তিনদিন অবস্থান করেন। এ সময় আবু বকর (রা.)-এর পুত্র আব্দুল্লাহও এখানে রাত যাপন করতেন। আয়িশা (রা.) বলেন, আব্দুল্লাহ ছিল খুব বুদ্ধিমান যুবক। সে শেষ রাতে উভয়ের নিকট থেকে চলে আসত। মক্কায় তাকে সকাল বেলাই দেখা যেত। যে কেউ দেখে ভাবত, রাতে সে মক্কাতেই ছিল। সারাদিন উভয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের যেসব কথা শুনত, সন্ধ্যায় আধার ঘনিয়ে এলে সেসব খবর নিয়ে 'গারে ছূরে চলে যেত।

কোবায় অবস্থান

নবুয়তের চতুর্দশ বছরের ৮ই রবিউল আউয়াল, ১লা হিজরী মোতাবেক ২৩শে সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের সোমবার রসূল ﷺ কোবায় অবতরণ করেন। এ সময়েই তিনি মাসজিদে কোবার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন এবং সে মাসজিদে সলাত আদায় করেন। নবুয়তের পর এটাই প্রথম মাসজিদ, তাকওয়ার ওপর যার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিলো।

মদীনায় প্রবেশ

৫ম, ১২তম, বা ২৬তম দিনের শুক্রবারে তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। পথিমধ্যে জুমার সলাত আদায় করেন। জুমার সলাত আদায়ের পর মদীনায় যান। সেদিন থেকে ইয়াসরিবের নাম হয়েছে 'মদিনাতুর রসূল' বা রসূল ﷺ -এর শহর সংক্ষেপে মদীনা হয়ে যায়। এ সময় নাবী ﷺ এর বয়স ছিল ৫৩ বছর। এ বছর হতে পরবর্তীকালে হিজরী সন গণনা শুরু হয়।

মাসজিদে নববী নির্মাণ

নাবী কারীম ﷺ ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১লা হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল শুক্রবার বনু নাজ্জার গোত্রের আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর বাড়ীর সামনে অবতরণ করেন। সে সময় তিনি বলেছিলেন, 'ইনশাল্লাহ এখানে মনযিল হবে।' এরপর তিনি আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর গৃহে প্রবেশ করেন।

অতঃপর নাবী কারীম ﷺ প্রথম পদক্ষেপেই মাসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। মাসজিদ নির্মাণের জন্যে তিনি সে স্থানই নির্ধারণ করেন, যেখানে তাঁর উট বসে গিয়েছিলো। সে ভূমির মালিক ছিলো দুই এতিম বালক। রসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছ থেকে নায্য মূল্যে সেই ভূমি ক্রয় করে মাসজিদ নির্মাণ কাজ শুরু করেন।

মাসজিদের দরজায় দু'টি খুটি ছিল পাথরের। কাঁচা ইট এবং কাদা দিয়ে গাঁথা হয়েছিল দেয়ালসমূহ। ছাদের উপর খেজুর শাখা এবং পাতা বিছিয়ে দেয়া হল। তিনটি দরজা লাগান হল। কেবলার সামনের দেয়াল থেকে পেছনের দেয়াল পর্যন্ত একশ' হাত দৈর্ঘ ছিল। প্রস্থ ছিল এর চেয়ে কম। ভিত ছিল প্রায় তিন হাত গভীর। নাবী কারীম ﷺ মাসজিদের পাশে কয়েকটি কাঁচা ঘর তৈরী করেন। এসব ঘরের দেয়াল খেজুর পাতা ও শাখা দিয়ে তৈরী। এসব ছিলো নাবী ﷺ -এর স্ত্রীদের বাসগৃহ। এগুলো তৈরী হওয়ার পর রসূলুল্লাহ ﷺ আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর ঘর থেকে এখানে এসে ওঠেন।

বৈঠকে কেমন আদব দেখাতেন

- যখন বৈঠকাদিতে যেতেন, তখন সাহাবীগণ তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়াক, এটা পছন্দ করতেন না। বৈঠকের এক পাশেই বসে পড়তেন। ঘাড় ডিংগিয়ে ভেতরে ঢুকতেন না।
- কেউ তাঁর কাছে এলে তাঁকে নিজের চাদর বিছিয়ে বসতে দিতেন। আগন্তুক নিজে না ওঠা পর্যন্ত তিনি বৈঠক ছেড়ে উঠতেন না।
- বৈঠকের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি মনোযোগ দিতেন, যাতে কেউ অনুভব না করে যে, তিনি তার উপর অন্য কাউকে প্রাধান্য দিচ্ছেন।

নির্মিত মাসজিদ কেবল সলাত আদায়ের জন্যেই ছিল না, বরং এটি ছিল একটি বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই মুসলিমরা ইসলামের শিক্ষা ও হিদায়াত সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতো। এছাড়া এ মাসজিদের অবস্থা ছিল একটি সংসদের মতো। এতে মজলিসে পরামর্শ সভা এবং ব্যবস্থাপনা পরিয়দের অধিবেশন বসতো। সাথে সাথে এ মাসজিদই এক বিপুল সংখ্যক নিঃস্ব মুহাজিরের আবাস ছিলো, সেখানে যাদের বাড়ীঘর, পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ কিছুই ছিলো না।

হিজরতের প্রথম থেকেই আযানের প্রচলন হয়। এ আযান ছিলো উর্ধ্বজগতের সঙ্গীত। যে সঙ্গীতের সুর দিনে পাঁচ বার দিক দিগন্ত মুখরিত হয়ে ওঠতো।

বদরের যুদ্ধ

মুসলিমদের প্রথম যুদ্ধ। এটি ছিলো দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ই রমাদানের রাত। এ মাসের ৮ বা ১২ তারিখ তিনি মদীনা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন।

মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা

রসূলুল্লাহ ﷺ বদরের উদ্দেশ্যে রওনাকালে তাঁর সঙ্গে তিনশর কিছু বেশী সংখ্যক সাহাবী ছিলেন। এ সংখ্যা কারো মতে ৩১৩, কারো মতে ৩১৪ এবং কারো মতে ৩১৭। এদের মধ্যে ৮২, মতান্তরে ৮৬ জন ছিল মুহাজির, অবশিষ্ট সকলেই আনসার। আনসারদের মধ্যে ৬১ জন আওস আর ৭০ জন খাযরাজ গোত্রের অন্তর্ভূক্ত ছিল। মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের জন্যে বিশেষ কোনো ব্যবস্থা বা তেমন কোনো প্রস্তুতি নেয়নি। সমগ্র সেনাদলে ঘোড়া ছিল মাত্র ২টি। ৭০টি উট ছিল, প্রতিটি উটে দুই বা তিনজন পর্যায়ক্রমে আরোহন করতেন।

মক্কা বাহিনীর সংখ্যা

প্রথম দিকে মক্কা বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল তেরোশ' । তাদের কাছে একশ' ঘোড়া এবং ছয়শ' বর্ম ছিলো । উটের সংখ্যা ছিল অনেক । এ বাহিনীর অধিনায়ক ছিলো আবু জাহিল ইবনে হিশাম । কুরাইশদের নয় জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এ বাহিনীর খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব নেয় । একদিন নয়টি, অন্যদিন দশটি উট যবাই করা হতো ।

বদরের প্রান্তরে নাবী কারীম ﷺ এর দু'আ

রসূলুল্লাহ ﷺ মুজাহিদদের কাতার সোজা করার পর নিজের অবস্থান কেন্দ্রে ফিরে এসে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্যের ওয়াদা পূরণের জন্যে আবেদন জানাচ্ছিলেন । তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ তা'আলা! তুমি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছো তা পূরণ করো । হে আল্লাহ তা'আলা! আমি তোমার কাছে তোমার প্রতিশ্রুত সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি ।

উভয় পক্ষে প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর রসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর দরবারে এ দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ রব্বুল আলামীন! যদি আজ মুসলিমদের এই দল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তবে দুনিয়ায় তোমার ইবাদত করার মত কেউ থাকবে না । "হে আল্লাহ তা'আলা! তুমি কি এটা চাও, আজকের পরে কখনোই তোমার ইবাদত করা না হোক?"

রসূলুল্লাহ ﷺ অতিশয় বিনয় ও নম্রতার সাথে কাতর কণ্ঠে এ মুনাজাত করছিলেন । তাঁর কাতরোক্তির একপর্যায়ে উভয় কাঁধ থেকে চাদর পড়ে যায় । আবু বকর (রা.) নাবী কারীম ﷺ -এর চাদর ঠিক করে দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এবার থামুন । আপনি তো আপনার প্রতিপালকের কাছে অতিশয় কাতরতার সাথে মুনাজাত করেছেন । এদিকে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

"স্মরণ কর যখন তোমার রব ফিরিশতাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন যে, 'আমি তোমাদের সাথে আছি ।' সুতরাং তোমরা মু'মিনদেরকে দৃঢ় রাখ, যারা কুফুরী করে, আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব সুতরাং তাদের কাঁধ ও আঙ্গুলির জোড়ায় জোড়ায় আঘাত হান ।"

(সূরা আন'ফাল ঃ ১২)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রসূল ﷺ -এর কাছে এ মর্মে ওহী প্রেরণ করলেন যে,

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাহায্য করবো, এক হাজার ফিরিশতা দ্বারা, যারা একের পর এক আসবে ।" (সূরা আন'ফাল ঃ ৯)

ফিরিশতাদের অবতরণ

এরপর রসূল ﷺ -এর কাছে জিবরাঈল (আ.) এলেন । তিনি তৎক্ষণাৎ মাথা তুলে বললেন, আবু বকর, সন্তুষ্ট হও, এই যে জিবরাঈল গায়ে ধুলোবালি মাখা অবস্থায় এসেছেন । ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, নাবী কারীম ﷺ বলেন, আবু বকর, খুশী হও, তোমাদের কাছে আল্লাহর সাহায্য এসে পৌঁছেছে । এই যে জিবরাঈল (আ.) ঘোড়ার লাগাম ধরে ঘোড়ার আগে আগে আসছেন এবং ধুলোবালি উড়ছে ।

এরপর নাবী কারীম ﷺ ছাপরা ঘরের দরজা দিয়ে বাইরে আসেন। এ সময় তিনি বর্ম পরিহিত ছিলেন। তিনি উদ্দীপনাময় ভঙ্গিতে সামনে অগ্রসর হতে হতে বলছিলেন, *"এ দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে।" (সূরা কামার ঃ ৪৫)*

এরপর নাবী কারীম ﷺ কুরাইশদের দিকে মুখ করে বললেন, 'শাহাতিল উজুহ' অর্থাৎ ওদের চেহারা আচ্ছন্ন হোক। একথা বলেই তিনি তাদের প্রতি ধুলা নিক্ষেপ করেন। এ নিক্ষিপ্ত ধূলা প্রত্যেক কাফিরের চোখ, মুখ, নাক ও গলায় প্রবেশ করে। তাদের একজনও বাদ থাকেনি। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

"এবং তখন তুমি নিক্ষেপ করনি, বরং আল্লাহ তা'আলাই নিক্ষেপ করেছিলেন।"
(সূরা আনফাল ঃ ১৮)

নাবী কারীম ﷺ -এর উৎসাহ ও উদ্দীপনায় সাহাবারা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। এ সময়ে ফিরিশতারাও মুসলিমদের সাহায্য করেন। ইবনে সাদ এর বর্ণনায় ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, সেদিন মানুষের মাথা কেটে যাচ্ছিল। অথচ বোঝা যাচ্ছিলো না যে, কে তার মাথা কাটছে। মানুষের কাটা হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় অথচ কে কেটেছে তা বোঝা যায় না।

কাফিরদের পরাজয়

কিছুক্ষণের মধ্যেই মুশরিক বাহিনীতে ব্যর্থতা ও হতাশার সুস্পষ্ট লক্ষণ ফুটে ওঠে। মুসলিমদের প্রবল আক্রমণের মুখে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তে থাকে। যুদ্ধের পরিণাম সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অতঃপর মুশরিক বাহিনী বিশৃংখলভাবে পিছনের দিকে পলায়ণ করতে থাকে। তাদের মাঝে ভীতি ছেয়ে পড়ে। মুসলিমরা তাদের কাউকে হত্যা, কাউকে যখম করছিলেন, কাউকে গ্রেফতার করে বেঁধে নিয়ে আসছিলেন। আর তাদের পেছনে ধাওয়া করছিলো। শেষ পর্যন্ত কাফিররা পুরোপুরি সুস্পষ্ট পরাজয় বরণ করে।

দ্বিতীয় হিজরীর রমাদান মাসে সিয়াম (রোযা) এবং সদকাতুল ফিতর ফরয করা হয়। যাকাতের পরিমাণ অর্থাৎ নিসাবও এ সময়ে নির্ধারণ করা হয়। মুসলিমরা প্রথমবারের মতো ঈদ উদযাপন করেছিলো দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে।

ওহুদের যুদ্ধ

ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তৃতীয় হিজরীর ৬ই শাওয়াল, শুক্রবার। বদরের যুদ্ধের পর কাফিররা সম্মিলিতভাবে এ সিদ্ধান্ত নিল যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে আরেকটি যুদ্ধ করে তারা তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিবে। সিদ্ধান্ত নেয়ার পরপরই তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য নতুন করে প্রস্তুতি শুরু করে দেয়।

এ যুদ্ধে নাবী ﷺ -এর চাচা হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবও ছিলেন। বদরের যুদ্ধে তিনি বিশেষ বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা ছিল সর্বমোট এক হাজার। এদের মধ্যে ১০০ জন বর্মধারী এবং ৫০ জন ছিলেন ঘোড় সওয়ার।

মুনাফিকদের বিশ্বাসঘাতকতা

ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগেই রসূল ﷺ ওহুদ ও মদীনার মাঝামাঝি স্থান থেকে রওয়ানা হন এবং সাওতে গিয়ে ফযরের সলাত আদায় করেন। তখন তিনি এবং শত্রু বাহিনী একেবারে কাছাকাছি অবস্থানে থেকে একে অপরকে দেখছিলো। এখানে পৌঁছতেই মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং ৩০০ লোককে সাথে নিয়ে এখান থেকে ফিরে যায়। এ সময় সে বলছিলো, আমরা বুঝতে পাচ্ছি না কেন জীবন দিতে যাবো? সে এ বিতর্ক প্রকাশ করে যে, রসূল ﷺ অন্যদের কথা মেনেছেন, তার কথা মানেননি।

ইসলামী বাহিনী ওহুদের পাদদেশে

মুনাফিকদের ফিরে যাওয়ার পর রসূলুল্লাহ ﷺ অবশিষ্ট ৭০০ মুসলিমকে সাথে নিয়ে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হন। শত্রুদের অবস্থান ছিল ওহুদ পর্বতের উল্টো দিকে। তাঁর এবং শত্রুর অবস্থানস্থলের মাঝে ওহুদ পাহাড় প্রতিবন্ধক ছিলো।

হামযা (রা.)-এর শাহাদাত

ওহুদের প্রান্তরে হামযা (রা.) বাঘের মতো লড়াই করছিলেন। বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে তিনি শত্রুদের বাধা ভেদ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তার সামনে বড় বড় বীর বাহাদুর কালবৈশাখীর ঝড়ে উড়ে যাওয়া পাতার মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল। মুশরিকদের নিশ্চিহ্ন করার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালনে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে কাফিরদের জন্যে ভীতিকর হয়ে উঠেছিলেন। কিছুসংখ্যক মুশরিক এ অবস্থা দেখে তাঁর সামনে গিয়ে মোকাবেলা করার সাহস না পেয়ে ভীরু কাপুরুষের মতো চুপিসারে তার উপর আঘাত করল। সেই আঘাতে হামযা (রা.) লুটিয়ে পড়লেন। হামযা (রা.)-এর হত্যাকারীর নাম ছিল ওয়াহশী ইবনে হারব।

হুদায়বিয়ার সন্ধি

আরব জাহানের পরিস্থিতি মুসলিমদের প্রায় অনুকূলে এসে গিয়েছিল। পর্যায়ক্রমে ইসলামী দাওয়াতের সাফল্য এবং বড়ো ধরনের বিজয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিলো। মাসজিদে হারামের দরজা মুসলিমদের জন্যে ছয় বছর যাবত বন্ধ করে রেখেছিলো। সেই পবিত্র মাসজিদে মুসলিমদের ইবাদাতের অধিকারের স্বীকৃতি আদায়ের প্রাথমিক উদ্যোগ শুরু হয়ে গিয়েছিলো।

মদীনায় রসূল ﷺ -কে স্বপ্ন দেখানো হলো, তিনি এবং সাহাবায়ে কিরাম মাসজিদে হারামে প্রবেশ করেছেন। কাবা ঘরের চাবি নিয়েছেন এবং সাহাবায়ে কিরামসহ কাবা ঘর তাওয়াফ ও ওমরা পালন করেন। রসূল ﷺ এই স্বপ্নের কথা সাহাবীদের জানান। রসূল ﷺ সাহাবাদের নিয়ে ওমরাহ পালন করার জন্য যাত্রা শুরু করেন। রসূলুল্লাহ ﷺ এবং মুসলিমরা মক্কাভিমুখে চলছেন। যুল হোলায়ফা নামক জায়গায় পৌঁছে রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কুরবানীর পশুকে কেলাদা (কুরবানীর পশুর বিশেষ নিদর্শন) পরান। উটের চুট চিরে চিহ্ন দেন এবং ওমরাহর জন্যে এহরাম বাঁধেন। তিনি এসব এ কারণের করেন যাতে সবাই নিশ্চিন্ত হতে পারে, তিনি কেবল ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যেই যাচ্ছেন, যুদ্ধের কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই।

মুসলিমদেরকে বায়তুল্লাহ থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা

এদিকে কুরাইশরা আল্লাহর রসূল ﷺ -এর রওয়ানা হওয়ার খবর পেয়ে পরামর্শ সভার বৈঠক অনুষ্ঠান করে এ মর্মে সিদ্ধান্তে পৌঁছে, যে কোন মূল্যে মুসলিমদের বায়তুল্লাহ থেকে দূরে রাখতে হবে। খালেদ ইবনে ওলীদ মুসলিমদের বাধা প্রদানের চেষ্টা করল।

অসুস্থ ব্যক্তি বা রোগী-কে দেখতে যাওয়া

- রোগী দেখতে যেতেন যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে।
- মাথার কাছে বসে জিজ্ঞাসা করতেন তুমি কেমন আছ?
- রুগ্ন ব্যক্তির কপালে ও ধমনীতে হাত রাখতেন। কখনোবা বুকে, পেটে ও মুখমন্ডলে স্বস্নেহে হাত বুলাতেন।
- রোগী কী খেয়েছে জিজ্ঞাসা করতেন।
- সে কোন কিছুর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করলে তা ক্ষতিকর না হলে এনে দিতেন।
- সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলতেন ঃ 'চিন্তার কোন কারণ নেই, আল্লাহ চাহেন তো অচিরেই তুমি রোগমুক্ত হবে।'
- রোগ মুক্তির জন্য দু'আ করতেন।

আল্লাহর রসূল ﷺ মক্কায় একজন দূত প্রেরণ করে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য কুরাইশদের নিকট সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। ওসমান (রা.) আল্লাহর রসূল ﷺ -এর ম্যাসেজ নিয়ে যাত্রা করেন। কুরাইশরা তাকে কাবাঘর তাওয়াফের প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। রসূলুল্লাহ ﷺ -এর পূর্বে কাবাঘর তাওয়াফ করা তিনি পছন্দ করলেন না। দীর্ঘ সময় ওসমানের (রা.) ফিরে না আসায় মুসলিমদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। আল্লাহর রসূল ﷺ -কে এ সংবাদ জানানো হলে তিনি বললেন, কুরাইশদের সাথে লড়াই না করা পর্যন্ত আমরা এ স্থান ত্যাগ করব না। তিনি সাহাবাদের বাইয়াতের জন্যে ডাকলেন। সাহাবারা এ মর্মে বাইয়াত করলেন যে, যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে কেউ পালাব না।

সন্ধির শর্তসমূহ

কুরাইশরা পরিস্থিতির নাজুকতা বুঝতে পেরে খুব দ্রুত সোহাইল ইবনে আমরকে সন্ধি সম্পাদনের উদ্দেশে পাঠায়। সোহাইলকে তাকিদ সহকারে বলে দেয়া হলো, মোহাম্মাদ এ বছর ফিরে যাবেন, সন্ধির শর্তে অবশ্যই এ কথা থাকতে হবে। তা না হলে আরবরা বলাবলি করবে, তিনি আমাদের শহরে জোর করে প্রবেশ করেছেন। রসূল ﷺ সোহায়লকে দেখে সাহাবীদের বললেন, তোমাদের কাজ সহজ করে দেয়া হয়েছে। এ লোকটিকে প্রেরণের অর্থ হচ্ছে, কুরাইশরা সন্ধি চায়। সোহায়ল রসূল ﷺ -এর কাছে এসে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ করেন। এরপর সন্ধির নিম্নরূপ শর্তাবলী প্রণয়ন করা হয়-

১) রসূল ﷺ এ বছর মক্কায় প্রবেশ না করেই ফিরে যাবেন। আগামী বছর মুসলিমরা মক্কায় আসবেন এবং তিন দিন অবস্থান করবেন। তাঁদের সাথে থাকবে সওয়ারের হাতিয়ার, তলোয়ার থাকবে কোষবদ্ধ। তাদের কোনো প্রকারে বিরক্ত করা হবে না।

২) উভয় পক্ষ দশ বছর যাবত যুদ্ধ বন্ধ রাখবে। এ সময়ে জনসাধারণ নিশ্চিন্ত নিরাপদ থাকবে। কেউ কারো ওপর হাত তুলবে না।

৩) যারা মুহাম্মাদ ﷺ -এর সাথে আর যারা কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে ইচ্ছা করে, তারা সেটা করতে পারবে। যে গোত্র যে পক্ষের শামিল হবে, সে গোত্র সে পক্ষের অংশ বিবেচিত হবে। কাজেই এমন কোনো গোত্রের ওপর বাড়াবাড়ি করা হলে সে গোত্র পক্ষের শামিল সে পক্ষের ওপর বাড়াবাড়ি মনে করা হবে।

৪) কুরাইশদের কোন লোক নেতাদের অনুমতি ছাড়া অর্থাৎ পালিয়ে মুহাম্মাদ ﷺ -এর কাছে চলে গেলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দেবেন, কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ -এর কেউ যদি আশ্রয়লাভের জন্যে কুরাইশদের কাছে আসে, তবে কুরাইশরা তাকে ফেরত দেবে না।

সন্ধির শর্তাবলীর সারকথা

এ হচ্ছে হুদায়বিয়ার সন্ধি। এ সন্ধির শর্তাবলী তার ভূমিকাসহ গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, নিঃসন্দেহে এটা ছিলো মুসলিমদের এক বিরাট বিজয়। কেননা এতোদিন যাবত কুরাইশরা মুসলিমদের অস্তিত্বই স্বীকার করছিলো না। হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে মুসলিমরা তাদের উদ্দেশ্য লক্ষ্য পুরোপুরি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এ স্বাধীনতার কারণে মুসলিমরা দাওয়াতের কাজে অসাধারণ সাফল্যলাভে সক্ষম হয়েছে। এ সন্ধির আগ পর্যন্ত মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা কখনোই তিন হাজারের বেশী ছিলো না, সে সংখ্যাই দুই বছরের মধ্যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে দশ হাজারে উন্নীত হয়েছে। সন্ধির দ্বিতীয় দফাও মূলত সুস্পষ্ট বিজয়ের অংশ। কেননা যুদ্ধের সূচনা মুসলিমরা নয় বরং কাফিররাই করেছিলো। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ওরাই প্রথমে তোমাদের সাথে শুরু করেছে'।

বিভিন্ন দেশের বাদশাহ এবং রাজাদের নামে চিঠি

ষষ্ঠ হিজরীর শেষ দিকে রসূল ﷺ হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার পর বিভিন্ন বাদশাহ ও আমীরের নামে চিঠি পাঠিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। রসূলুল্লাহ ﷺ এসব চিঠি পাঠানোর ইচ্ছা করলে তাঁকে বলা হয়, চিঠিতে সীলমোহর দেয়া হলে তবেই কোনো বাদশাহ তা গ্রহণ করবেন। এ কারণে রসূলুল্লাহ ﷺ একটি রূপার আংটি তৈরী করান, এতে মুহাম্মাদ, রসূল ও আল্লাহ এ শব্দ তিনটি খোদাই করা হয়েছিলো। আল্লাহ ১ম, রসূল ২য় এবং মুহাম্মাদ ৩য় লাইনে খোদায় করা হয়। (সহীহ বুখারী)

১) হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর নামে – নাজ্জাশীর প্রকৃত নাম ছিলো আসহামা ইবনে আবজার। রসূল ﷺ চিঠির অংশবিশেষ হলো ঃ *"হে আহলি কিতাব একটি বিষয়ের প্রতি আসুন, যা আমাদের এবং আপনাদের মধ্যে সমান। আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করব না। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করব না, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে প্রভু হিসেবে স্বীকার করব না। কেউ এ বিশ্বাস গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তাকে বলুন যে, সাক্ষী থাক, আমি মুসলিম।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৪)*

২) মিশরের বাদশাহ মোকাওকিসের নামে – রসূল ﷺ মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা জোরায়জ ইবনে মাত্তা'র কাছেও একখানা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। জোরায়জের উপাধি ছিলো মোকাওকিস। চিঠির অংশবিশেষ হলো ঃ পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল মোহাম্মাদের পক্ষ থেকে মোকাওকিস আযম কিবতের নামে। তার প্রতি সালাম যিনি হিদায়াতের আনুগত্য করেন। আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন।

ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দু'টি পুরস্কার দেবেন। আর ইসলাম গ্রহণ না করেন, তবে কিবতের অধিবাসীদের পাপও আপনার ওপর বর্তাবে। হে কিবতীরা, 'এমন একটি বিষয়ের প্রতি এসো যা আমাদের এবং তোমাদের জন্যে সমান। আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবো না এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবো না। আমাদের মধ্যে কেউ যেন আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে রব হিসাবে না মানে। যদি কেউ এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলিম।'

৩) পারস্য সম্রাট খসরু পারভেযের নামে – রসূলুল্লাহ ﷺ পারস্য সম্রাট কিসরার নিকটেও একখানি চিঠি পাঠান। চিঠির অংশবিশেষ হলো ঃ সালাম সেই ব্যক্তির প্রতি, যিনি হিদায়াতের আনুগত্য করেন এবং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরিক নেই, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসূল। আমি আপনাকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। কারণ আমি সকল মানুষের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত।

৪) রোম সম্রাট কায়সারের নামে – রসূল ﷺ রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসকেও চিঠি দিয়েছিলেন। চিঠির অংশবিশেষ হলো ঃ *"হে আহলি কিতাব একটি বিষয়ের প্রতি আসুন, যা আমাদের এবং আপনাদের মধ্যে সমান। আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করব না। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করব না, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে প্রভু হিসেবে স্বীকার করব না। কেউ এ বিশ্বাস গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তাকে বলুন যে, সাক্ষী থাক, আমি মুসলিম।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৪)*

৫) মুনযের ইবনে সাদির নামে – আল্লাহর রসূল ﷺ মুনযের ইবনে সাদির নিকটে একটি চিঠি লিখে তাকেও ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। মুনযের ছিলেন বাহরাইনের শাসক।

৬) ইয়ামামার রাজার নামে – আল্লাহর রসূল ﷺ ইয়ামামার রাজা হাওযা ইবনে আলীর নিকট একখানি চিঠি লিখে তাকেও ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন।

৭) দামেশকের শাসক গাসসানীর নামে – আল্লাহর রসূল ﷺ দামেশকের শাসনকর্তা হারেস ইবনে আবু শিমার গাসসানীর নিকট একটি চিঠি লিখে তাকেও ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন।

৮) আম্মানের বাদশাহের নামে – আল্লাহর রসূল ﷺ আম্মানের বাদশাহ যেফার এবং তার ভাই আবদের নামেও একটি চিঠি লেখেন।

এ সকল চিঠির মাধ্যমে রসূলুল্লাহ ﷺ বিশ্বের অধিকাংশ এলাকায় তাঁর দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন। জবাবে কেউ ঈমান এনেছে, কেউ কুফরীর ওপরই অটল থেকেছে।

খায়বর অভিমুখে যাত্রা

আল্লাহর রসূল ﷺ হোদায়বিয়া থেকে ফিরে এসে পুরো জিলহাজ্জ মাস এবং মহররম মাসের কয়েকদিন মদীনায় অবস্থান করেন। এরপর মহররম মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে খায়বরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

খায়বর বিজয় ছিল আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। তিনি বলেছেন, *"আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রতিশ্রুতি দিলেন, যার অধিকারী হবে তোমরা। তিনি তা তোমাদের জন্যে তড়িঘড়ি করেছিলেন।" (সূরা ফাতহ ঃ ২০)*

তা তোমাদের জন্যে তড়িঘড়ি করেছেন বলে হোদায়বিয়ার সন্ধির কথা বোঝানো হয়েছে। আর যুদ্ধলব্ধ বিপুল সম্পদ বলতে খায়বরের কথা বোঝানো হয়েছে।

যারা মুনাফিক এবং দুর্বল ঈমানের অধিকারী তারা হোদায়বিয়ার সফরে আল্লাহর রসূল ﷺ -এর সাথে গমন না করে স্বগৃহে বসে থাকে। এ কারণে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর রসূল ﷺ-কে এ সম্পর্কে আদেশ দিয়ে বলেন,

"তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্যে যাবে, তখন যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল, তারা বলবে, আমাদেরকে তোমাদের সাথে যেতে দাও। ওরা আল্লাহর ওয়াদা পরিবর্তন করতে চায়। বল, তোমরা কিছুতেই আমাদের সাথী হতে পারবে না। আল্লাহ পূর্বেই বলে দিয়েছেন। ওরা বলবে, বরং হিংসা কর। বস্তুত ওদের বোধশক্তি সামান্য।" (সূরা ফাতহ ঃ ১৫)

আল্লাহর রসূল ﷺ খায়বর অভিমুখে যাত্রার আগে ঘোষণা করলেন যে, তাঁর সাথে কেবল ওই সকল লোকই যেতে পারবে, যাদের মূলতঃই জিহাদের প্রতি আগ্রহ রয়েছে। এ ঘোষণার ফলে শুধুমাত্র যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল, যারা হোদায়বিয়ার গাছের নীচে বাইয়াতে রেযোয়ানে অংশ নিয়েছিল। এদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশ'।

মৃত ব্যক্তির প্রতি যা করতেন

- কেউ মারা গেলে সেখানে চলে যেতেন।
- মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনকে সমবেদনা জ্ঞাপন করতেন।
- ধৈর্যের উপদেশ দিতেন এবং চিৎকার করে কাঁদতে নিষেধ করতেন।
- সাদা কাপড়ে কাফন দিতে তাগিদ দিতেন এবং দাফন কাফন দ্রুত সম্পন্ন করতে বলতেন।
- দাফনের জন্য লাশ নিয়ে যাবার সময় সাথে সাথে যেতেন।
- মুসলিমদের জানাযা নিজেই পড়াতেন এবং গুনাহ মাফ করার জন্য দু'আ করতেন।
- তিনি প্রতিবেশীদের উপদেশ দিতেন মৃতের পরিবারের জন্য খাবার পাঠাতে।

মুতার যুদ্ধ

মুতা জর্দানের বালকা এলাকার নিকটবর্তী একটি জনপদ। এ জায়গা থেকে বায়তুল মাকদাসের দূরত্ব মাত্র দুই মনযিল (প্রায় ৩৮ মাইল)। এখানেই মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

রসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় মুসলিমরা যেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এ যুদ্ধ ছিল সেসবের মধ্যে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী। এ যুদ্ধই খৃষ্টান অধিষ্ঠিত দেশসমূহ জয়ের পথ খুলে দেয়। অষ্টম হিজরীর জমাদিউল আউয়াল ইসায়ী ৬২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

যুদ্ধের কারণ

এ অভিযানের কারণ হল, আল্লাহর রসূল ﷺ হারেস ইবনে ওমায়ের আযদী (রা.)-কে একটি চিঠিসহ বোসরার গভর্নরের কাছে প্রেরণ করেন। রোমের কায়সারের গভর্নর শরহাবিল ইবনে আমর গাসসানি তখন বালকা এলাকায়

নিযুক্ত ছিলো। এ দুর্বৃত্ত রসূলুল্লাহ ﷺ -এর দূতকে গ্রেফতার এবং শক্তভাবে বেঁধে হত্যা করে। রাষ্ট্রদূত বা সাধারণ দূতদের হত্যা করা গুরুতর অপরাধ ছিলো। এটা যুদ্ধ ঘোষণার শামিল, এমনকি এর চেয়েও গুরুতর মনে করা হতো। দূত হত্যার খবর শোনার পর খুবই মর্মাহত হন। এ কারণে তিনি সে এলাকায় অভিযান পরিচালনার জন্যে সৈন্যদের প্রস্তুতির নির্দেশ দেন। তিন হাজার সৈন্যের বাহিনী তৈরী করা হয়।

হতাহতের সংখ্যা

মুতার যুদ্ধে ১২ জন মুসলিম শাহাদাত বরণ করেন। রোমকদের মধ্যে কতোসংখ্যক হতাহত হয়েছে তার বর্ণনা জানা যায়নি। তবে যুদ্ধের বিবরণ পাঠে বোঝা যায় যে, তাদের বহু হতাহত হয়েছে। কেননা, একমাত্র খালিদের হাতেই ৯টি তরবারি ভেঙ্গেছিল। এতেই শত্রু সৈন্যদের হতাহতের সংখ্যা অতিসহজেই আন্দাজ করা যায়।

মুতার যুদ্ধের প্রভাব

যে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে মুতা অভিযানে যাওয়া হয়েছিল, সেটা সম্ভব না হলেও এ লড়াইয়ের ফলে মুসলিমদের সুনাম সুখ্যাতি বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। সমগ্র আরব জাহান বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। কেননা, রোমকরা ছিল সে সময়ের শ্রেষ্ঠ শক্তি। আরবরা মনে করত যে, রোমকদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হওয়া মানে আত্মহত্যার শামিল। সুতরাং উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া তিন হাজার সৈন্য দু লক্ষ সৈন্যের সাথে লড়াইয়ে সাহসিকতাপূর্ণ বিজয় গৌরব সহজ কথা নয়। আরবের জনগণ বুঝতে সক্ষম হয়েছিল যে, ইতোপূর্বে পরিচিত সকল শক্তির চেয়ে মুসলিমরা সম্পূর্ণ পৃথক। আল্লাহর সাহায্য মুসলিমদের সাথে রয়েছে।

বয়স্কদের প্রতি ব্যবহার

- বুড়ো মানুষদের খুবই শ্রদ্ধা করতেন এবং সাহায্য করতেন।
- তিনি কখনো স্ত্রী বা চাকর চাকরানীদের মারেননি।
- তিন বিধবাদের সবসময় সাহায্য করতেন।

মক্কা বিজয়

এটা সেই মহান বিজয়, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীন ইসলাম, রসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর বাহিনী এবং দ্বীন ইসলামের হিফাজতকারীদের মর্যাদা প্রদান করেছেন। এছাড়া তাঁর শহর ও ঘর- যে ঘরকে জগতের মানুষের হিদায়াতের মাধ্যম করেছিলেন, সেই ঘরকে কাফির মুশরিকদের হাত থেকে মুক্ত করেন। এ বিজয়ের ফলে আসমানবাসীদের মধ্যে আনন্দের ঢল বয়ে যায়। এ বিজয়ের ফলে আল্লাহর দ্বীনে মানুষ দলে দলে প্রবেশ করতে শুরু করে।

মক্কার পথে মুসলিম বাহিনী

অষ্টম হিজরীর ১০ই রমাদান। রসূল ﷺ মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ১০ হাজার সাহাবী। এ সময় মদীনার তত্ত্বাবধানের জন্যে আবু রোহম গিফারীকে নিযুক্ত করা হয়।

মক্কা অভিমুখে মুসলিম বাহিনী

অষ্টম হিজরীর ১৭ই রমাদান সকাল বেলা রসূল ﷺ মাররুয যাহরান থেকে মক্কার দিকে রওয়ানা হন এবং আব্বাসকে (রা.) নির্দেশ দেন, আবু সুফিয়ানকে যেন প্রান্তরের সংকীর্ণ জায়গায় পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড় করিয়ে রাখেন। আবু সুফিয়ান এতে সে পথ দিয়ে অতিক্রমকারী আল্লাহর সৈনিকদের দেখতে পাবে। রসূল ﷺ নির্দেশ পাওয়ার পর সেনাপতিরা নিজ নিজ সৈন্যদল নিয়ে নির্দিষ্ট পথে মক্কায় প্রবেশের উদ্দেশে রওয়ানা করেন।

মাসজিদে হারামে প্রবেশ এবং মূর্তি অপসারণ

রসূল কারীম ﷺ আনসার ও মুহাজিরদের সংগে নিয়ে মাসজিদে হারাম-বায়তুল্লায় প্রবেশ করেন। প্রথমে তিনি হাযারে আসওয়াদ চুম্বন করলেন। এরপর কাবা ঘর তাওয়াফ করেন। সে সময় রসূলে কারীম ﷺ -এর হাতে একটি ধনুক ছিলো।

কাবা ঘরের আশেপাশে এবং ছাদের ওপর সে সময় ৩৬০টি মূর্তি ছিলো। রসূলে কারীম ﷺ তাঁর হাতের ধনুক দিয়ে সেসব মূর্তিকে গুঁতো দিচ্ছিলেন আর পবিত্র কুরআনের এ আয়াতও উচ্চারণ করছিলেন, *"সত্য (ইসলাম) এসেছে এবং মিথ্যা (কুফর) বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হয়েই থাকে।" (সূরা বনী ইসরাইল ঃ ৮১)*

রসূল ﷺ তাঁর উটনীর ওপর বসে তাওয়াফ করেন। তাওয়াফ শেষ করার পর ওসমান ইবনে তালহা (রা.)-কে ডেকে তাঁর কাছ থেকে কাবা ঘরের চাবি নেন। এরপর রসূলে কারীম ﷺ এর নির্দেশে কাবা ঘর খোলা হয়। ভেতরে প্রবেশ করে তিনি অনেকগুলো ছবি দেখলেন। এ সব ছবির মধ্যে ইব্রাহীম এবং ইসমাইল (আ.)-এর ছবিও ছিলো। তাঁদের হাতে ছিল ভাগ্য গণনার তীর। এ দৃশ্য দেখে রসূলে কারীম ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের ধ্বংস করুন। আল্লাহর শপথ, এ দু'জন নাবী কখনোই ভাগ্য গণনায় তীর ব্যবহার করেননি। রসূলে কারীম ﷺ কাবা ঘরের ভেতর কাঠের তৈরী একটি কবুতরও দেখতে পান। তিনি নিজ হাতে সেটি ভেঙ্গে ফেলেন। তাঁর নির্দেশে ছবিগুলো নষ্ট করা হয়।

দলে দলে মানুষের ইসলাম গ্রহণ

মক্কা বিজয় এর ফলে আরববাসীদের সামনে মূর্তিপূজা মিথ্যা প্রকাশিত হয়ে তার অবসান ঘটে। সমগ্র আরবের জন্যে সত্য-মিথ্যা চিহ্নিত হয়ে যায়। এ কারণে মক্কা বিজয়ের পর তারা দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করে।

নবম ও দশম হিজরীতে মদীনায় বহু প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটে। সে সময় মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো। ফলে মক্কা বিজয়ের সময় যেখানে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার, অথচ এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তাবুকের যুদ্ধের সময় সে সংখ্যা ত্রিশ হাজারে উন্নীত হয়। বিদায় হাজ্জের সময় দেখা যায়, মুসলিমদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ২৪ হাজার, মতান্তরে ১ লাখ ৪৪ হাজার।

রসূল (সা.)-এর ব্যক্তিগত জীবন

- নিজের কাপড় চোপড়ের তদারকী নিজেই করতেন।
- ছাগলের দুধ নিজেই দোহাতেন এবং নিজের প্রয়োজনীয় কাজগুলো নিজেই করতেন।
- কাপড়ে তালি লাগাতে হলে নিজেই লাগাতেন, জুতো মেরামত করতেন।
- বোঝা বহন করতেন, পশুকে খাদ্য দিতেন।
- কোন চাকর থাকলে তার কাজে অংশ নিতেন।
- কখানো কোন চাকরকে ধমক পর্যন্ত দেননি।
- বাজারে যেতে কখনো লজ্জা বোধ করতেন না, নিজেই বাজার সদাই করে আনতেন।
- আপন পরিবার পরিজনের সাথে সহৃদয় আচরণে কোন জুড়ি ছিল না।

বিদায় হাজ্জ

রসূল (সা.)-এর আবেগ ও অনুভূতি

- রসূল (সা.)-এর মধ্যেও মানবীয় অনুভূতি সর্বোত্তম পর্যায়ে বিদ্যমান ছিল।
- তিনি ছিলেন তীব্র অনুভূতি সম্পন্ন মানুষ।
- আনন্দে আনন্দিত ও দুঃখে বেদনায় ব্যথিত হতেন।
- স্ত্রীদের প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালোবাসা ছিল।
- নিজের সন্তানদের প্রতিও স্নেহ মমতা ছিল অত্যন্ত গভীর।
- মেয়ে ফাতিমা (রা.)-এর দু'ছেলে হাসান ও হোসাইন (রা.)-কে অত্যধিক স্নেহ করতেন। তাদের কোলে নিতেন, ঘাড়ে উঠাতেন এবং নিজে ঘোড়া সেজে পিঠে চড়াতেন। সলাতের সময়ও তাদের ঘাড়ে উঠতে দিতেন।
- কোমল হৃদয় এবং এত আবেগভরা মন নিয়েও রসূল (সা.) কঠিন বিপদ মুসিবতে ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন।

যিলহাজ্জ মাসের আট তারিখে নাবী কারীম ﷺ মিনায় গমন করেন। দশম হিজরীর ৯ই যিলহাজ্জ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। যোহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং ফজর এ পাঁচ ওয়াক্ত নামায সেখানে আদায় করে সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। পরে আরাফা ময়দানের উদ্দেশে রওয়ানা হন। সেখানে পৌঁছে দেখেন, নামেরা প্রান্তরে তাঁবু প্রস্তুত রয়েছে। তিনি সেখানে অবতরণ করেন। সূর্য ঢলে পড়লে তাঁর আদেশে কাসওয়া উটনীর পিঠে আসন লাগানো হয়। তিনি প্রান্তরের মাঝামাঝি স্থানে গমন করেন। সে সময় তাঁর চারদিকে এক লাক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষের সমুদ্র বিদ্যমান ছিলো। তিনি সমবেত জনসমুদ্রের উদ্দেশে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। সে ভাষণে তিনি বলেন, 'হে লোকসকল, আমার কথা শোনো, আমি জানি না, এবারের পর তোমাদের সাথে এ জায়গায় আর মিলিত হতে পারবো কি না।' রসূলুল্লাহ ﷺ হাজ্জ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে আরাফার ময়দানে ভাষণ সমাপ্ত করার পর আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা মায়িদার ৩ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ করেন।

মৃত্যু শয্যায় রসূলুল্লাহ ﷺ

অসুখের উৎপত্তি ঃ একাদশ হিজরীর ২৯শে সফর, রোববার রসূলুল্লাহ ﷺ বাকী কবরস্থানে একটি জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। সেখান থেকে ফেরার পথে মাথা ব্যাথা শুরু হয় এবং উত্তাপ এত বৃদ্ধি পায় যে, মাথায় বাঁধা পট্টির উপর দিয়েও তাপ অনুভব করা গেছে। এটা ছিল তাঁর মৃত্যুর আগে অসুখের শুরু। তিনি সেই অসুস্থ অবস্থায়ই এগারো দিন নামায পড়ান। অসুখের মোট মেয়াদ ছিলো তেরো অথবা চৌদ্দ দিন।

আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পূর্ণতা অর্জন করেছে, আরব জাহান এখন ইসলামের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। এমন সময়ে একাদশ হিজরীর **১২ই** রবিউল আউয়াল সোমবার চাশত এর সলাতের শেষ সময়ে রসূলুল্লাহ ﷺ পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ -এর বয়স ছিল তখন প্রায় তেষট্টি বছর। হৃদয়বিদারক এ শোক সংবাদ অল্পক্ষণের মধ্যে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। মদীনার জনগণ শোকে অভিভূত হয়ে গেলেন।

আনাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যেদিন আমাদের মাঝে এসেছিলেন সেদিনের চেয়ে সমুজ্জল দিন আমি আর কখনো দেখিনি। আর যেদিন তিনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন, তার চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন দিন আমি আর কখনো দেখিনি। (সহীহ বুখারী)

দশম হিজরীর রমাদান মাসে রসূলুল্লাহ ﷺ বিশ দিন এতেকাফ পালন করেন অথচ অন্যান্য রমাদানে পালন করতেন দশদিন। জিবরাঈল (আ.) এ বছর রসূলুল্লাহ ﷺ -কে সমগ্র কুরআন শরীফ দু'বার পড়ে শোনালেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলেছিলেন, আমি জানি না, সম্ভবত এ বছরের পর এ স্থানে তোমাদের সাথে আমি আর কখনো মিলিত হতে পারবো না। জামরায়ে আকাবার নিকটে তিনি বলেন, আমার কাছ থেকে হাজ্জের নিয়মাবলী শিখে নাও, কেননা, আমি এ বছরের পর সম্ভবত আর কখনো হাজ্জ করতে পারবো না। আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি (১০, ১১, ১২ই যিলহাজ্জ) সময়ে সূরা নাসর নাযিল হয়। এরপর তিনি বুঝে ফেলেছিলেন, এবার এ দুনিয়া থেকে তাঁর বিদায় নেয়ার পালা। এ সূরা নাযিল হওয়া মানে হচ্ছে তাঁর মৃত্যুর একটা আগাম সংবাদ দেয়া।

রসূল (সা.)-এর কয়েকটি চমৎকার অভিরুচি

- কোন জিনিস দেয়া ও নেয়ার কাজ ডান হাত দিয়েই সম্পন্ন করতেন।
- চিঠি লিখতে হলে সর্বপ্রথম বিসমিল্লাহ লিখাতেন।
- রসূল (সা.) কল্পনা বিলাসিতা থেকে মুক্ত ছিলেন এবং কোন 'শুভ লক্ষণ' বা 'অশুভ লক্ষণে' বিশ্বাস করতেন না।
- ব্যক্তি ও স্থানের ভালো অর্থবোধক ও শ্রুতি মধুর নাম পছন্দ করতেন। খারাপ নাম পছন্দ করতেন না।
- হৈ চৈ ও হাঙ্গামা পছন্দ করতেন না।
- সব কাজে ধীর স্থির থাকা, নিয়ম শৃংখলা ও সময়ানুবর্তিতা ভালোবাসতেন।

জীবনের শেষ ভাষণ

জীবনের শেষ মুহূর্তে রসূল ﷺ প্রচন্ড জ্বরে ভুগছিলেন। ইন্তিকালের কয়েক দিন পূর্বে নাবী কারীম ﷺ কিছুটা সুস্থ অনুভব করলেন। গোছল করে তিনি আব্বাস (রা.) ও আলী (রা.)-এর সাহায্যে যখন মসজিদে পৌঁছলেন, তখন সলাতের জামাত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সলাতে ইমাম আবু বকর (রা.) অনুভব করতে পারলেন, পরম প্রিয়জন এসেছেন। তিনি ইমামের স্থান করে পেছনে সরে আসছিলেন যেন রসূল ﷺ সে স্থানে গিয়ে ইমাম হয়ে সলাত আদায় করাবেন। প্রিয় রসূল তাঁর প্রিয় সাথীকে ইশারা করলেন, সরে আসার প্রয়োজন নেই।

আল্লাহর নাবী ﷺ আবু বকর (রা.)-এর পাশেই দাঁড়ালেন। আবু বকর (রা.) নাবী কারীম ﷺ-কে অনুসরণ করলেন। আর সাহাবায়ে কেরাম অনুসরণ করলেন আবু বকর (রা.)-কে। এভাবে সবাই নাবী ﷺ-এর ইমামতিতে নামায আদায় করলেন। এই নামায আদায় যে কোন দিনের যোহরের নামায ছিল, এ সম্পর্কে মত পার্থক্য আছে। মুসলিম শরীফের বর্ণনা অনুসারে জানা যায়, ইন্তিকালের পাঁচদিন পূর্বের ঘটনা ছিল এটা।

সলাত শেষ করে নাবী ﷺ তাঁর পৃথিবীর জীবনের শেষ দায়িত্ব পালন করলেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামের সামনে তিনি সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, 'মহান আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে ক্ষমতা দিয়েছিলেন, সে দুনিয়ার জীবনে ভোগ বিলাসকে অগ্রাধিকার দিবে- না আখিরাতের জীবনের অমূল্য নিয়ামতকে প্রাধান্য দিবে। তিনি আল্লাহর কাছে রক্ষিত নেয়ামতসমূহে প্রাধান্য দিয়েছেন।'

আল্লাহর হাবিব ﷺ -এর মুখ থেকে এ কথা শোনার সাথে সাথে আবু বকর (রা.) নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। কাঁন্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। লোকজন তাঁর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন না আবু বকর

(রা.)-এর কাঁন্নার কারণ কী। কারণ রসূল ﷺ ভিন্ন এক লোকের কথা বললেন যে, সেই লোক আখিরাতের জীবনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু আবু বকর (রা.) স্পষ্টই অনুভব করলেন, সেই ব্যক্তি স্বয়ং নাবী ﷺ।

আল্লাহর নাবী ﷺ বললেন, 'আমি যার সান্নিধ্য লাভ করে সবচেয়ে অধিক উপকৃত হয়েছি, তিনি হলেন আবু বকর। যদি আমি এই পৃথিবীতে কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে সক্ষম হতাম তাহলে আমি আবু বকরকেই প্রাধান্য দিতাম। কিন্তু আল্লাহর ইসলামের ভিত্তিতে যে সম্পর্ক স্থাপন হয় সে সম্পর্কই বন্ধুত্বের জন্য যথেষ্ট। তোমাদের পূর্বের জাতিসমূহ নিজেদের নাবী এবং সৎলোকদের কবরকে ইবাদাতের স্থানে পরিণত করেছিল। সেখানে তাদের মূর্তি স্থাপন করেছিল। আমি তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছি, তোমরা কখনো এমন করবে না।'

রসূল ﷺ অসুস্থ, এ কথা সর্বত্রই প্রচার হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত মানুষের চেহারা যেন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার ছায়া ঢেকে রেখেছিল। কারো মুখেই হাসি নেই, নেই সে খুশীর উচ্ছাস। তাঁরা যাকে নিয়ে আনন্দ করে, সেই নাবী অসুস্থ। আনসারদের প্রতি বিশ্বনাবীর অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁরা কাঁন্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। সংবাদ এলো, আনসারদের ভেতরে কাঁন্নার রোল পড়েছে। আবু বকর (রা.) এবং আব্বাস (রা.) তাদের কাছে ছুটে গেলেন। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা এমন করে কাঁদছো কেন?'

তাঁরা জানালো, 'আমাদের প্রতি আল্লাহর নাবীর অবদানের কথা স্মরণ করেই আমরা কাঁদছি।' আল্লাহর নাবীর কাছে এই সংবাদ গেল যে, তাঁর দুর্দিনের সাথীগণ আনসাররা তাঁর অসুস্থতার সংবাদ শুনে শুধুই কাঁদছে। তিনি সেই দিনের কথা স্মরণ করলেন। এই আনসাররা কিভাবে তাঁকে এবং মক্কার হিজরতকারী মুসলিমদেরকে জীবনের সমস্ত কিছু উজাড় করে দিয়ে সাহায্য করেছে। তিনি যখন ছিলেন আশ্রয়হীন, তখন তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আশ্রয় দিয়েছিলো।

রসূল (সা.)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট

রসূল (সা.)-কে 'জাওয়ামিউল কালিম' দ্বারা ভূষিত করা হয়েছিল। রসূল (সা.)-এর যে সংক্ষিপ্ততম বাক্যগুলো ব্যাপক তাৎপর্য বহন করে তাকেই বলা হয় 'জাওয়ামিউল কালিম'। কিছু উদাহরণ নিম্নরূপ ঃ

- মানুষ যাকে ভালোবাসে, কিয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে।
- মুসলিম হও শান্তিতে থাকতে পারবে।
- নিয়ত অনুসারে কাজের বিচার হবে।
- যে কাজ করে, সে কেবল আপন নিয়ত অনুযায়ীই তার ফল পাবে।
- দেখা ও শোনা এক কথা নয়।
- বৈঠকের জন্য বিশ্বস্ততা জরুরী।
- খারাপ কাজ বর্জন করাও একটা ভালো কাজ।
- জনগণের যিনি সেবা করেন, তিনিই তাদের নেতা।
- প্রত্যেক সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা পোষণ করা হয়।
- ভালো কথা বলাও সৎ কাজের শামিল।
- যে দয়া করে না সে দয়া পায় না।

আল্লাহর নাবী ﷺ রোগাক্রান্ত কণ্ঠে উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, 'আমি আনসারদের সম্পর্কে তোমাদেরকে অসিয়ত করে যাচ্ছি, সমস্ত মুসলিমদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি লাভ করবে। তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না। আহার করার মত বস্তুর ভেতরে যেমন লবনের সংখ্যা কম থাকে। আনসাররা তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। এখন তাদের প্রতি তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালন করবে। আনসারদের সাথে আমার এমন সম্পর্ক যে, দেহের সাথে যেমন হৃদপিন্ডের সম্পর্ক। যে ব্যক্তির হাতে মুসলিমদের সমস্ত কিছুর দায়িত্ব অর্পন হবে, তাদের দায়িত্ব হলো আনসারদের মধ্যে যোগ্যতা সম্পন্নদেরকে গ্রহণ করা এবং তাদের ভুলসমূহ ক্ষমা করে দেয়া।'

অর্থাৎ মুসলিমদের ভেতরে যিনি খলীফা হবেন, তিনি যেন আনসারদের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেন। তাদের ভেতরে যিনি যে কাজের যোগ্য তাকে সেই কাজ দেন।

আল্লাহর নাবী ﷺ বলেছিলেন, 'হালাল ও হারামের নির্ধারণকে তোমরা আমার উপরে করো না। মহান আল্লাহ যা হারাম করেছেন,

আমি তা হারাম ঘোষণা করছি। মানুষের কৃতকর্মের বিনিময় তার নিজের কর্মের উপরেই নির্ভর করবে।'

এরপর তিনি তাঁর আপন কলিজার টুকরাদের প্রতি আহবান জানিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর নাবীর কন্যা ফাতিমা! হে আল্লাহর নাবীর ফুফু সুফিয়া! আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবার মত সম্পদ সংগ্রহ করো। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে গ্রেফতার হওয়া থেকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবো না।'

বিদায় হাজ্জের ভাষণে মানব কল্যাণের জন্য মুহাম্মাদ ﷺ এর শেষ নির্দেশ

১. জাহিলিয়াতের (অজ্ঞতার) যুগের সমস্ত অন্ধ বিশ্বাস এবং প্রথা, অনাচার, কুসংস্কার আমার পায়ের নীচে দলিত মথিত হলো।

২. অজ্ঞতার যুগের রক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ আজ থেকে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল।

৩. সে যুগের সুদ প্রথাও বন্ধ করে দিলাম।

৪. একজন অপরাধ করলে আরেকজনকে শাস্তি দেয়া তথা পিতার অপরাধের কারণে সন্তানকে বা সন্তানের অপরাধের কারণে পিতাকে কোন শাস্তি দেয়া যাবে না।

৫. যদি কোন নাক কাটা কালো নিগ্রো গোলামকেও তোমাদের নেতা নির্বাচন করা হয় এবং সে যদি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে, তাহলে তোমরা তাঁর আনুগত্য করবে। তাঁর নির্দেশ পালন করবে।

৬. সাবধান! দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে সীমা লংঘন করো না। এই সীমা লংঘনের কারণে অতীতে অনেক জাতি ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়েছে।

৭. মনে রেখো, তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হতে হবে এবং সমস্ত কাজের হিসাব তাঁর কাছে দিতে হবে।

৮. সাবধান! আমার পরে তোমরা পথ ভ্রষ্ট হয়ে কাফিরদের মত একে অপরের রক্তপাত করো না।

৯. সাবধান! তোমাদের পরস্পরের ধন-সম্পদ পরস্পরের কাছে আজকের পবিত্র দিনের মত, এই পবিত্র মাসের মত এবং এই পবিত্র মক্কার মতই পবিত্র।

রসূল (সা.)-এর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ঃ ইসলাম কী?
উত্তর ঃ ভালো কথা বলা ও ক্ষুধার্তদের খাওয়ানো।

প্রশ্ন ঃ ঈমান কী?
উত্তর ঃ ধৈর্য ও দানশীলতা।

প্রশ্ন ঃ কার ইসলাম সর্বোত্তম?
উত্তর ঃ যার জিহ্বা ও হাতের বাড়াবাড়ি (অর্থাৎ মন্দ কাজ ও মন্দ কথা) থেকে মানুষ নিরাপদে থাকে।

প্রশ্ন ঃ কার ঈমান উৎকৃষ্ট?
উত্তর ঃ যার চরিত্র ভালো তার।

প্রশ্ন ঃ কি ধরনের সলাত উত্তম?
উত্তর ঃ যে সলাতে বিনয়ের সাথে দীর্ঘ সময় দাঁড়ানো হয়।

প্রশ্ন ঃ কি ধরনের হিজরত উত্তম?
উত্তর ঃ তোমার প্রতিপালকের অপছন্দনীয় জিনিসগুলোকে চিরতরে পরিত্যাগ করা।

প্রশ্ন ঃ কোন সময়টা সর্বোত্তম?
উত্তর ঃ রাতের শেষ প্রহর।

প্রশ্ন ঃ প্রধানত কোন জিনিস মানুষের জন্য জাহান্নাম অনিবার্য করে তোলে?
উত্তর ঃ মুখ ও লজ্জাস্থান। (তিরমিযী)

১০. জেনে রেখো, আরবদের উপরে অনারবদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অনারবদের আরবদের উপরে কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

১১. সবাই আদমের সন্তান আর আদম হলো মাটি থেকে সৃষ্টি। মনে রেখো, এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই এবং সমস্ত মুসলিমদের নিয়ে একটা অবিচ্ছেদ্য সমাজ।

১২. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না।

১৩. ন্যায়ের ভিত্তি ব্যতীত তোমরা কাউকে হত্যা করো না।

১৪. অপরের জিনিষ আত্মসাৎ করো না।

১৫. ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেও না।

১৬. আমি তোমাদের কাছে যা রেখে যাচ্ছি, তা যদি দৃঢ়ভাবে ধারণ করে রাখো, তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব এবং আমার প্রদর্শিত পথ রেখে যাচ্ছি। (অর্থাৎ রসূলের সুন্নাত)

১৭. নারীদের সম্পর্কে আমি তোমাদের সতর্ক করছি, তাদের সাথে নিষ্ঠুর ব্যবহার করার ব্যাপারে আল্লাহর আযাবকে ভয় করো।

১৮. তোমরা তাদেরকে (তোমাদের স্ত্রীদেরকে) আল্লাহর জিম্মাদারীতে গ্রহণ করেছো। আল্লাহর নির্দেশের আওতায় তোমরা নিজেদের জন্য তাদেকে বৈধ করে নিয়েছো।

১৯. তোমাদের স্ত্রীর উপর যেমন তোমাদের অধিকার রয়েছে, তেমনি তাদেরও তোমাদের উপর অধিকার রয়েছে। মনে রেখো, তোমরাই তাদের আশ্রয়।

২০. আমি তোমাদেরকে তোমাদের দাস-দাসী সম্পর্কে সাবধান করছি। তাদের উপরে কোন ধরণের নির্যাতন করবে না। তাদের সাথে এমন ব্যবহার করো না যে, তারা মনে আঘাত পায়। তোমরা যা আহার করবে, তোমরা যা পরিধান করবে তাদেরকেও তাই আহার করাবে এবং তাই পরিধান করাবে।

২১. হে উপস্থিত জনমন্ডলী! শয়তান হতাশ হয়েছে। কারণ আরবে সে আর কোনদিন পূজা লাভ করবে না। কিন্তু সাবধান! তোমরা যাকে ছোট মনে করো, তার ভেতর দিয়েই শয়তান তোমাদের মহাক্ষতি সাধন করে। তোমরা এ সম্পর্কে সতর্ক হও।

২২. হে মানুষ! আমার পরে আর কোন নাবীর আগমন ঘটবে না। তোমাদের পরে আর কোন নতুন উম্মত সৃষ্টি হবে না। এই বছরের পরে তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়ত আর হবে না। সুতরাং জ্ঞান অপৃত হবার পূর্বেই আমার কাছে হতে শিক্ষা গ্রহণ করো।

রেফারেন্স ঃ বিদায় হাজ্জের ভাষণ বিভিন্ন হাদীসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তবে বেশীরভাগ অংশ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে। ছোটদের মুখস্ত করার সুবিধার্থে এখানে পয়েন্ট আকারে দেয়া হলো।

মুহাম্মাদ ﷺ এর নিকটতম বংশধরগণ

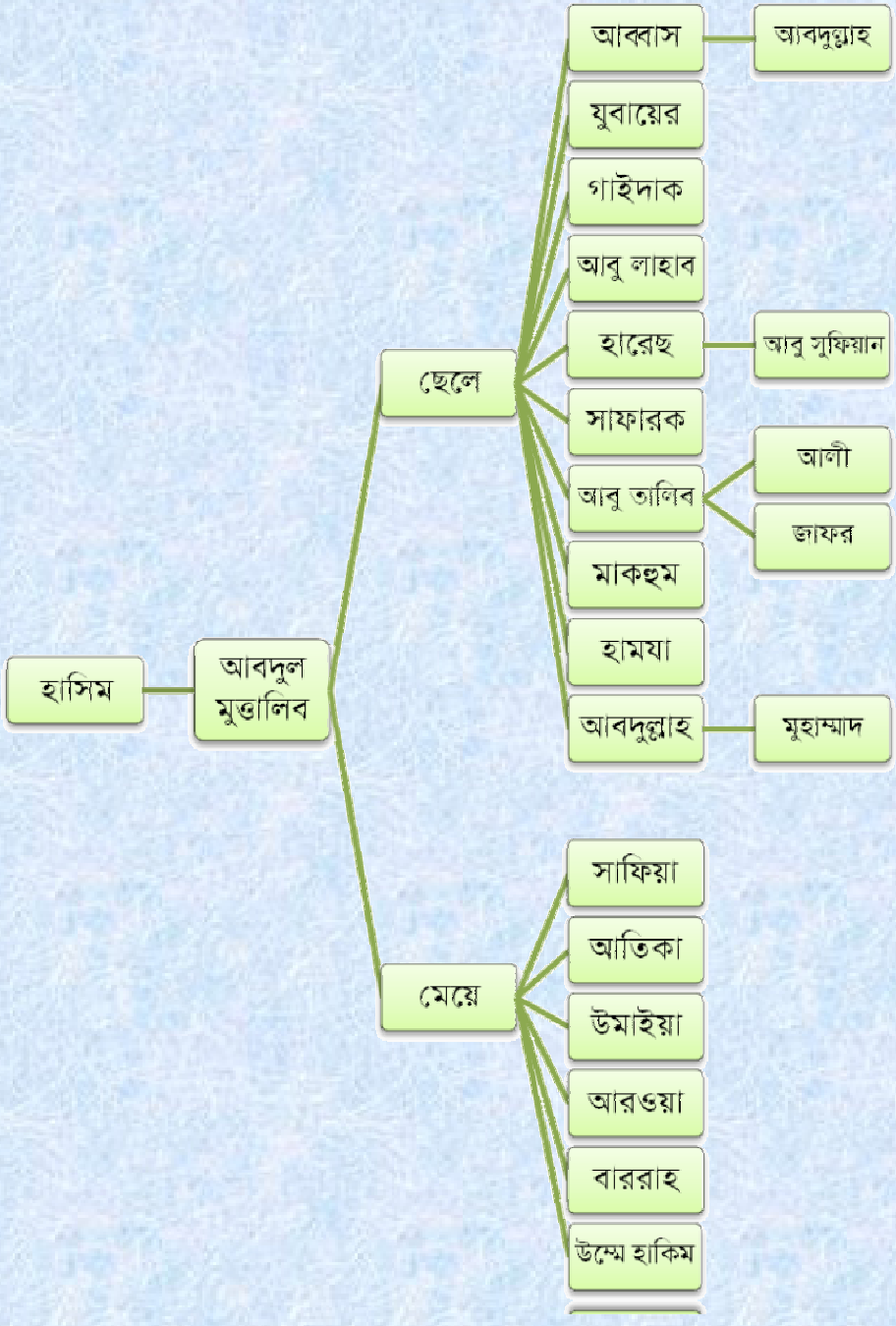

মুহাম্মাদ ﷺ এর পুত্র কন্যাগণ

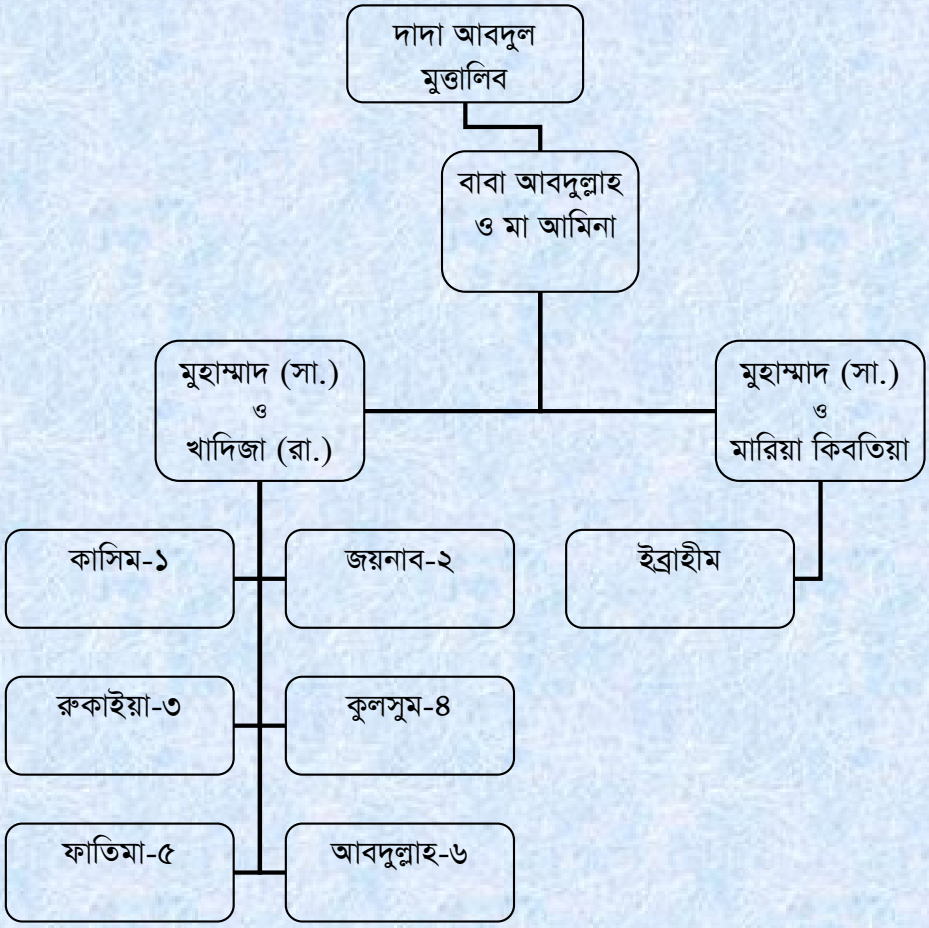

বইটি পড়ার পর মুহাম্মাদ ﷺ এর জীবনী জানার জন্য আমরা নিম্মের কার্টুন ছবি এবং মুভি ইউটিউব থেকে দেখতে পারি।

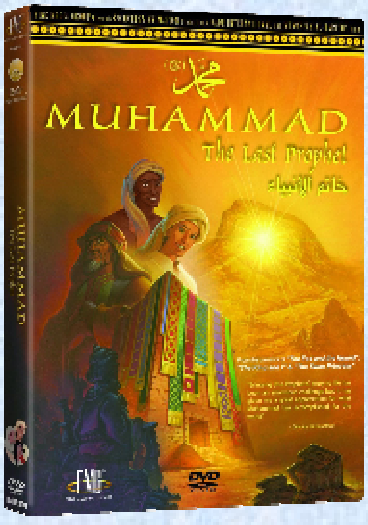

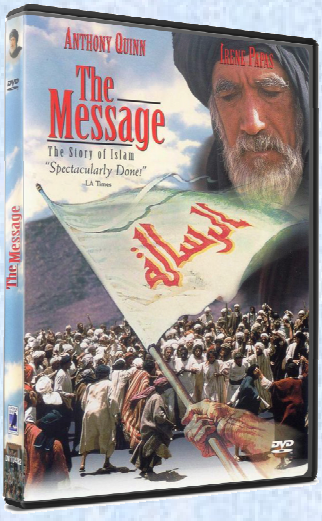

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

১) রসূল মুহাম্মাদ ﷺ -এর জন্ম কোথায় এবং কবে হয়েছিল?

২) মুহাম্মাদ ﷺ -এর বাবা মায়ের নাম কি ছিল?

৩) মুহাম্মাদ ﷺ -এর দাদার নাম কি ছিল?

৪) হাতীর ঘটনা কি ছিল? বিস্তারিত লিখ ।

৫) দাদার মৃত্যুর পর মুহাম্মাদ ﷺ -কে কোন চাচা লালনপালন করেছিলেন?

৬) মুহাম্মাদ ﷺ -এর দুধ মা কে ছিলেন এবং কত বয়স পর্যন্ত তার সাথে ছিলেন?

৭) মুহাম্মাদ ﷺ কত বয়সে ইয়াতিম হন? এবং তাঁর শৈশব ও কৈশোর কিভাবে কেটেছে?

৮) মুহাম্মাদ ﷺ কত বছর বয়সে বিবাহ করেছিলেন এবং কার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল?

৯) কাবা গৃহের পুন নির্মাণ এবং হাজরে আসওয়াদের বিরোধ মিমাংসা কিভাবে হয়েছিল?

১০) কত বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন? এবং কোথায়?

১১) জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ ﷺ -এর কোথায় সাক্ষাৎ হয়েছিল?

১২) সর্বপ্রথম কোন সূরা নাযিল হয়? এবং কত আয়াত নাযিল হয়?

১৩) নাবী মুহাম্মাদ ﷺ ইসলামের দাওয়াতের কাজে কি ধরনের কষ্ট সহ্য করেছিলেন?

১৪) সর্বপ্রথম মক্কার সাহাবীরা কোন দেশে হিজরত করেছিলেন?

১৫) হামযা (রা.) এবং ওমর (রা.) কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন?

১৬) মক্কাবাসীদের বয়কটের ঘটনা বিস্তারিত লিখ ।

১৭) শাবি আবু তালিব নামক উপতক্যায় সবাই কি ধরনের কষ্ট ভোগ করেছিলেন?

১৮) মুহাম্মাদ ﷺ -এর শোক-দুঃখের বছর কেমন ছিল?

১৯) তায়েফে মুহাম্মাদ ﷺ -এর দাওয়াতী মিশন কী ছিল?

২০) তায়েফে তিনি কিভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন?

২১) নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর মিরাজের ঘটনা লিখ?

২২) মুহাম্মাদ ﷺ মক্কায় কত বছর তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন?

২৩) নাবী মুহাম্মাদ ﷺ কোন সালে মক্কা থেকে মদীনায় হিযরত করেন? এবং কেন করেন?

২৪) মদীনার লোকেরা কিভাবে মুহাম্মাদ ﷺ -কে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল?

২৫) মদীনার সাহাবীদেরকে কী বলা হয়? এবং মক্কার সাহাবীদেরকে কী বলা হয়?

২৬) মদীনায় প্রথম মসজিদ কে নির্মাণ করেন এবং তার নাম কি?

২৭) বদরের যুদ্ধ কবে হয়েছিল এবং কাদের সাথে হয়েছিল?

২৮) মক্কাবাসীদের সাথে প্রথম সন্ধি কেন হয়েছিল এবং এর নাম কি ছিল?

২৯) নাবী মুহাম্মাদ ﷺ পৃথিবীর কোন কোন দেশের রাজার নিকট ইসলামের দাওয়াত পাঠিয়েছিলেন?

৩০) ওহুদের যুদ্ধ কবে এবং কোথায় হয়েছিল বিস্তারিত লিখ ।

৩১) মুতার যুদ্ধের ঘটনা বিস্তারিত লিখ।

৩২) নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর দাওয়াতের সফলতা সম্পর্কে লিখ?

৩৩) মদীনায় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ কত বছর ছিলেন?

৩৪) বিদায় হাজ্জের ভাষণের সার সংক্ষেপ লিখ?

৩৫) নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর মত্যুর ঘটনা বিস্তারিত লিখ।

৩৬) নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর স্ত্রীদের নাম কি ছিল?

৩৭) নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর সন্তানদের নাম কি ছিল?

৩৮) শিশুদের প্রতি মুহাম্মাদ ﷺ -এর স্নেহ-ভালবাসা কিরূপ ছিল?

৩৯) নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল?

৪০) নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর কথা-বার্তার নমুনা কেমন ছিল?

৪১) নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর বক্তৃতার নমুনা কেমন ছিল?

৪২) নাবী মুহাম্মাদ ﷺ কিভাবে সালামের প্রচলন করেছিলেন?

৪৩) নাবী মুহাম্মাদ ﷺ কোন বৈঠকে কেমন আদব দেখাতেন?

৪৪) নাবী মুহাম্মাদ ﷺ অসুস্থ ব্যক্তি বা রোগীকে দেখতে গিয়ে কী কী করতেন?

৪৫) মৃত ব্যক্তির প্রতি মুহাম্মাদ ﷺ -এর আদব কী কী ছিল?

৪৬) বয়স্কদের প্রতি নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর ব্যবহার কিরূপ ছিল?

৪৭) নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর ব্যক্তিগত জীবন কেমন ছিল?

৪৮) নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর আবেগ ও অনুভূতি কেমন ছিল?

৪৯) নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর কয়েকটি চমৎকার অভিরুচি লিখ?

৫০) নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর অন্যতম বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

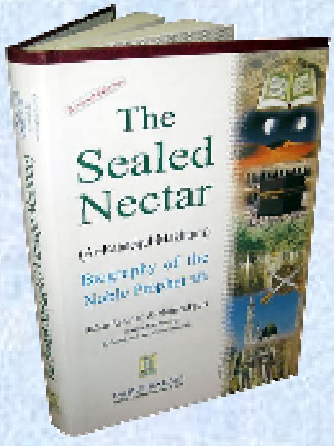

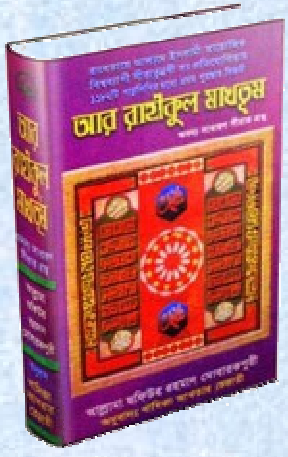

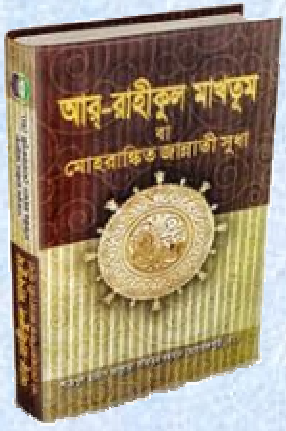

রেফারেন্স ঃ আর-রাহীকুল মাখতুম / The Sealed Nectar